অনেক বিবাহ করেছিলেন। কেননা, স্ত্রীর মহব্বত দূরের কথা, দুনিয়ার সকল বস্তু মিলেও তাঁর অন্তরকে আল্লাহ তাআলার দিক থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর মহব্বতে তাঁর মগ্নতা এতদূর ছিল যে, মাঝে মাঝে যখন মহব্বতের উত্তাপ অন্তরে উথলে উঠত, তখন অন্তর বিস্ফারিত হওয়ার আশংকা দেখা দিত। তিনি তখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উরুতে করাঘাত করে বলতেন, কিছু কথাবার্তা বল। তাঁর কথাবার্তার ফলে উত্তাপ কিছুটা প্রশমিত হত। সুতরাং অন্য কোন ব্যক্তি নিজেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে তুলনা করতে পারে না। করলে সে ধোকা খাবে।

মোট কথা, প্রাথমিক পর্যায়ে অবিবাহিত থাকাই মুরীদের জন্যে উপযুক্ত। আবু সোলায়মান বলেন ঃ যে বিবাহ করে, সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমি এমন কোন মুরীদ দেখিনি যে বিবাহ করে পূর্বাবস্থায় বহাল রয়েছে। যে কোন বস্তু আল্লাহ্ থেকে বিরত রাখে– স্ত্রী হোক, অর্থ হোক অথবা সন্তান-সন্ততি হোক, তাকেই অলক্ষুণে মনে করা উচিত। তবে মুরীদের অবিবাহিত থাকা তখন পর্যন্তই শোভনীয়, যে পর্যন্ত খাহেশ জোরালো না হয়। খাহেশ প্রবল হতে দেখলে প্রথমে ক্ষুধা ও সার্বক্ষণিক রোযা দ্বারা তা দমন করবে। এতেও দমিত না হলে খাহেশকে শান্ত করার জন্যে বিবাহ করবে। নতুবা দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হবে না এবং উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হবে। দৃষ্টির গোনাহ সগীরা গোনাহসমূহের মধ্যে অনেক বড়। এ থেকে কবীরা গোনাহ্ও হয়ে থাকে। যে তার দৃষ্টি আয়ত্তে রাখতে পারে না, সে তার দ্বীনদারীরও হেফাযত করতে পারে না। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ তাকানো থেকে বেঁচে থাক। এর কারণে অন্তরে খাহেশের বীজ পড়ে এবং এতটুকু অনর্থই যথেষ্ট। হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়র বলেন ঃ কেবল দৃষ্টির কারণে হযরত দাউদ (আঃ) অনর্থে লিপ্ত হন। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আঃ) এরশাদ করেন ঃ সিংহ ও সর্পের পেছনে যেয়ো; কিন্তু নারীর পেছনে যেয়ো না। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ যিনার সূচনা কিভাবে হয়? তিনি বললেন ঃ দেখা ও বাসনা করার মাধ্যমে। হযরত ফোযায়ল এরশাদ করেন, ইবলীস বলে ঃ দৃষ্টি আমার প্রাচীন তীর ধনুক, যা কখনও ভুল করে না। দৃষ্টি সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ)-এর উক্তিসমূহ নিম্নরূপ–

اَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُوْمٌ مِّنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِىْ قَلْبِهِ -

দৃষ্টি ইবলীসের তীরসমূহের মধ্যে একটি বিষাক্ত তীর। যে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে এটি পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন ঈমান দেবেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।

مَا تَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

–আমি আমার পরে পুরুষদের জন্যে নারীদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোন ফেতনা ছেড়ে যাইনি।

اِتَّقُوْا فِتْنَةَ الدُّنْيَا وَفِتْنَةَ النِّسَاءِ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ -

–তোমরা দুনিয়ার ফেতনা ও নারীদের ফেতনা থেকে বেঁচে থাক। বনী ইসরাঈলের প্রথম ফেতনা নারীদের পক্ষ থেকেই ছিল।

لِكُلِّ بَنِىْ اٰدَمَ حَظٌّ مِّنَ الزِّنَا فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ الحديث -

–প্রত্যেক মানুষের জন্যে যিনার কিছু অংশ আছে। কেননা, চক্ষুদ্বয় যিনা করে। তাদের যিনা হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা। হস্তদ্বয় যিনা করে। তাদের যিনা হচ্ছে স্পর্শ করা। পদদ্বয় যিনা করে, তাদের যিনা হচ্ছে হাঁটা। মুখ যিনা করে। তার যিনা হচ্ছে বলা। অন্তর ইচ্ছা ও বাসনা করে। লজ্জাস্থান তাকে সত্যে পরিণত অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ الاية মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাযত করে।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন ঃ একবার অন্ধ ইবনে মকতুম (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আসতে চাইলেন। তখন আমি ও মায়মুনা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি আমাদেরকে পর্দা করতে বললেন। আমরা বললাম, সে তো অন্ধ। পর্দা করার প্রয়োজন কি? তিনি বললেন ঃ তোমরা তো তাকে দেখ।

এ থেকে জানা গেল, নারীদের অন্ধের কাছে বসা এবং বিনা প্রয়োজনে তার সাথে কথা বলা জায়েয নয়। আজকাল এটা প্রচলিত আছে। হাঁ, প্রয়োজনের সময় নারী পুরুষের সাথে কথা বলতে অথবা দেখতে পারে।

যদি মুরীদের অবস্থা এমন হয় যে, সে নারীদের থেকে তো দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে পারে; কিন্তু বালকদের থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারে না; তবুও বিবাহ করা উত্তম। কেননা, বালকদের সৌন্দর্যপ্রীতির মধ্যে অনিষ্ট বেশী। কোন নারীর প্রতি মন আকৃষ্ট হয়ে গেলে তাকে বিবাহ করে মনের আশা পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু বালকদের দ্বারা এটা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই বালককে কুদৃষ্টিতে দেখা হারাম। এক্ষেত্রে মানুষ খুব শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং পরিণামে ধ্বংসের মুখে পড়ে। জনৈক তাবেয়ী বলেন ঃ যুবক সাধকের সাথে শ্মশ্রুবিহীন বালকের উঠাবসা আমি হিংস্র জন্তুর চেয়েও অধিক ভয় করি। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি খাহেশবশতঃ কোন বালকের পায়ের অঙ্গুলিতেও সুড়সুড়ি দেয়, তবুও সে সমকামী হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ এই উম্মতে তিন প্রকার সমকামী হবে। কেউ তো কেবল দেখবে, কেউ করমর্দন করবে এবং কেউ কুকর্মই করবে। এ থেকে বুঝা গেল, দৃষ্টির কারণে বড় বড় বিপদের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং যখন আপন দৃষ্টি ফেরাতে এবং চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে না, তখন বিবাহ করাই তার জন্যে শ্রেয়ঃ। অধিকাংশ মানুষের যৌন উত্তেজনা ক্ষুধার কারণে হ্রাস পায় না। সেমতে জনৈক বুযুর্গ বর্ণনা করেন, সাধনার প্রথম পর্যায়ে একবার আমার উপর খাহেশ প্রবল হয়ে গেলে আমি আল্লাহর দরবারে খুব কান্নাকাটি করলাম। স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমার কি অবস্থা? আমি ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ এগিয়ে এস। আমি এগিয়ে গেলাম। তিনি আপন হাত আমার বুকের উপর রাখলেন। আমি এর শীতলতা অন্তরে ও দেহে অনুভব করলাম। সকালে ঘুম থেকে জেগে নিজের মধ্যে সেই যৌন উত্তেজনা পেলাম না। এক বছর কাল এ অবস্থা বহাল রইল। এরপর আবার প্রাবল্য দেখা দিল। আমি আবার হাহুতাশ করলে স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখলাম। সে বলল ঃ যদি তুমি তোমার ঘাড় কাটাতে সম্মত হও, তবে আমি তোমার চিকিৎসা করি। আমি বললাম ঃ উত্তম। সে বলল ঃ ঘাড় নত কর। আমি ঘাড় নত করলে সে একটি নূরের তরবারি দিয়ে আমার ঘাড়ে আঘাত করল। আমার নিদ্রা ভঙ্গ হল। এক বছর কাল আবার সুস্থ থাকার পর পুনরায় সেই রোগ দ্বিগুণ বেগে দেখা দিল। এ অবস্থায় এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলাম, সে আমার বক্ষ ও পাঁজরের মাঝখানে বসে আমাকে বলছে ঃ যে বিষয়টি দূর করা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়, তা দূর করার জন্য আর কতদিন কাকুতি মিনতি করবে? এরপর

আমি জাগ্রত হয়ে বিবাহ করলাম এবং সন্তানাদি হল। এখন সেই খাহেশের জোর আর নেই।

সুতরাং মুরীদের বিবাহ করার প্রয়োজন দেখা দিলে বিবাহের শুরুতে নিয়ত ভাল রাখবে এবং পরিণামে জরুরী হক আদায় করবে। নিয়ত ভাল রাখার আলামত হচ্ছে, কোন সম্বলহীন ধর্মপরায়ণা মহিলাকে বিবাহ করবে, বিত্তশালিনী তালাশ করবে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ বিত্তশালিনী মহিলাকে বিবাহ করার অনিষ্ট পাঁচটি, (১) মোহরানা বেশী হওয়া, (২) স্বামী গৃহে গমনে ইতস্ততঃ করা, (৩) সেবা না করা, (৪) অধিক ব্যয়ভার বহন করা এবং (৫) ত্যাগ করতে মনে চাইলে বিত্তের লোভে তা না পারা। পক্ষান্তরে সম্বলহীনাকে বিবাহ করার মধ্যে এরূপ কোন অনিষ্ট নেই। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ চারটি বিষয়ে নারীর পুরুষের চেয়ে কম হওয়া চাই। নতুবা সে পুরুষকে হেয় মনে করবে। চারটি বিষয় এই ঃ বয়সে, দৈহিক গড়নে, অর্থকড়িতে এবং বংশ মর্যাদায়। পক্ষান্তরে চারটি বিষয়ে নারীর পুরুষের চেয়ে বেশী হওয়া দরকার– সৌন্দর্যে, শিষ্টাচারে, সংযমে এবং চরিত্রে। পরিণামে জরুরী হক আদায়ের আলামত হচ্ছে সদা সদাচার প্রদর্শন করা। জনৈক মুরীদ বিবাহ করে সদা সর্বদা স্ত্রীর সেবাযত্ন করতে থাকে। অবশেষে স্ত্রী লজ্জিত হয়ে তার পিতা-মাতাকে বলল ঃ আমি আমার স্বামীর সদাচারে বিস্মিত হয়েছি। এত বছর ধরে তার গৃহে যখনই পায়খানা করতে যাই তখনই সে বদনা আমার পূর্বে সেখানে রেখে দেয়। অন্য একজন বুযুর্গ জনৈকা রূপসী মহিলাকে বিবাহ করেন। স্বামী গৃহে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে স্ত্রী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হল। তার পরিবারের লোকজন মহাচিন্তায় পড়ল, এখন স্বামী তাকে পছন্দ করবে না। বুযুর্গ ব্যক্তি সংবাদ পেয়ে প্রথমে চক্ষু রোগের বাহানা করলেন, এরপর অন্ধ সেজে গেলেন। স্ত্রী স্বামী গৃহে এসে বিশ বছর সদ্ভাবে সংসার করার পর মারা গেল। এরপর বুযুর্গ ব্যক্তি চক্ষু খুললেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি ইচ্ছা করেই অন্ধ সেজেছিলাম যাতে শ্বশুরালয়ের লোকেরা দুঃখ না করেন। এতে সকলেই পরম বিস্ময় প্রকাশ করে বলল ঃ এমন সদাচারী লোক দুনিয়াতে দ্বিতীয়জন আর নেই। জনৈক সুফী এক বদমেযাজ মহিলাকে বিবাহ করে সর্বদাই তার কটূক্তি সহ্য করতে থাকেন। লোকেরা বলল ঃ আপনি এই মহিলাকে তালাক দেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আশংকা হয়, অন্য কোন ব্যক্তি তার হাতে নিপীড়িত হবে। অতএব মুরীদ বিবাহ করলে এরূপই হওয়া উচিত। আর

যদি বিবাহ ছাড়া থাকতে পারে এবং বিবাহের কারণে আখেরাতের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে মনে করে, তবে বিবাহ না করাই উত্তম।

বর্ণিত আছে, মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান হাশেমীর দৈনিক আমদানী ছিল আশি হাজার দেরহাম। তিনি বসরার আলেমগণের কাছে এ মর্মে পত্র লেখলেন ঃ আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করতে চাই। আপনারা পছন্দ করে দিন। সকলেই একমত হয়ে তাঁকে জওয়াব দিলেন, রাবেয়া বসরীয়াকে বিবাহ করাই আপনার জন্যে উপযুক্ত। সেমতে তিনি রাবেয়া বসরীয়াকে এভাবে পত্র লেখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। হামদ ও সালাতের পর আবেদন হল, আল্লাহ তাআলা আমাকে আজ দৈনিক আশি হাজার দেরহাম আমদানী দিয়েছেন। আশা করা যায়, কিছু দিন পরেই আমদানী বৃদ্ধি পেয়ে দৈনিক এক লাখ দেরহাম হয়ে যাবে। যদি তুমি আমাকে মঞ্জুর কর, তবে এই ধন-সম্পদ সমস্তই তোমার হবে। –ইতি

হযরত রাবেয়া বসরীয়া এই পত্রের জওয়াবে লেখলেন ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, হামদ ও না'তের পর জানাচ্ছি, সংসার নির্লিপ্ততার মধ্যেই অন্তরের শান্তি ও দেহের সুখ নিহিত এবং দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ দুঃখ ও অশান্তির কারণ। পত্র পাওয়ার সাথে সাথে আপনার উচিত পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা এবং পরকালের চিন্তায় মগ্ন হওয়া। আপনি নিজেই নিজের ওছি হয়ে যান, যাতে ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টনের জন্যে অন্যকে ওছি নিযুক্ত করার প্রয়োজন না থাকে। সারা জীবন রোযা রাখুন এবং মৃত্যুর সময় ইফতার করুন। আমার অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে আপনার সমপরিমাণ অথবা আরও কয়েকগুণ বেশী ধন-সম্পদ দিয়ে দেন, তবুও এক মুহূর্ত আল্লাহকে স্মরণ না করে থাকতে পারব না। –ইতি

এ থেকে জানা যায়, যে বিষয় আল্লাহর স্মরণে অন্তরায় হয়, তা ত্রুটিযুক্ত। সুতরাং মুরীদ তার অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে গভীর চিন্তা করবে। অবিবাহিত থাকা সম্ভব না হলে বিবাহ করা উত্তম। এ রোগের তিনটি প্রতিকার রয়েছে– প্রথম অনাহারে থাকা দ্বিতীয়, দৃষ্টি সংযত রাখা এবং তৃতীয়, অন্তরকে এমন কাজে ব্যস্ত রাখা, যাতে আচ্ছন্ন রাখে। এ তিনটি তদবীরে কোন উপকার না হলে সর্বশেষে বিবাহ করতে হবে। এতে এ রোগের মূল উৎপাটিত হয়ে যায়। এ কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তাড়াহুড়া করে কন্যাদের বিবাহ দিতেন। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন ঃ

শয়তান কারও তরফ থেকে নিরাশ হয় না। সে নারীদের দ্বারা অবশ্যই ফাঁদ পাতে।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িবের বয়স যখন চৌরাশি বছরে পৌঁছে, তখন তাঁর একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে যায় এবং অপর চক্ষু থেকেও পানি ঝরতে থাকে। তখনও তিনি বলতেন ঃ আমি নারীদের চেয়ে অধিক অন্য কিছুকে ভয় করি না। আবদুল্লাহ ইবনে আবী ওদায়া বলেন ঃ আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসতাম। কয়েক দিন যাইনি। এরপর একদিন গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কয়দিন কোথায় ছিলে? আমি বললাম ঃ আমার স্ত্রী মারা গিয়েছিল। তাই হাযির হতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে খবর দিলে না কেন? এরপর আমি প্রস্থানোদ্যত হলে তিনি বললেন ঃ খুব তো চলে যাচ্ছ; কিন্তু জিজ্ঞেস করি, পরে বিয়ে শাদী করলে কি না? আমি আরজ করলাম ঃ হুযুর, আমি গরীব মানুষ। আমাকে কে কন্যা দান করবে। তিনি বললেন ঃ আমি দিচ্ছি। আমি সবিস্ময়ে বললাম ঃ আপনি ! তিনি বললেন ঃ হাঁ। অতঃপর খোতবা পাঠ করে সামান্য মোহরানার বিনিময়ে আপন কন্যার বিবাহ আমার সাথে সম্পন্ন করে দিলেন। আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে সেখান থেকে চলে এলাম এবং কারও কাছ থেকে কিছু কর্জ নেয়ার কথা ভাবছিলাম। ইতিমধ্যে মাগরিবের সময় হয়ে গেল। আমি নামায পড়ে গৃহে ফিরে এলাম। বাতি জ্বালিয়ে রুটি ও তেল নিয়ে ইফতার করতে বসলাম। এমন সময় দরজা থেকে করাঘাতের শব্দ কানে ভেসে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কে? জওয়াব এল ঃ সায়ীদ। আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম, কোন্ সায়ীদ হতে পারে! সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব হবেন, তা কল্পনায়ও ছিল না। কারণ, তিনি চল্লিশ বছর ধরে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া সম্পূর্ণ মওকুফ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দরজা খুলেই দেখি, সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব দণ্ডায়মান। আমি ধারণা করলাম, বোধ হয় কোন সাংঘাতিক প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছেন। আমি আরজ করলাম ঃ আমাকে ডেকে নিলেন না কেন? তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে আসাই সমীচীন মনে হল। আমি বললাম ঃ আদেশ করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি বিবাহ করেছ। এখন একাকী শয়ন করবে– এটা আমার কাছে ভাল মনে হয়নি। তাই তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে পৌঁছে দিতে এসেছি। আমি ভাল করে দেখতেই দেখি, বাস্তবে সেই ভাগ্যবতী কন্যা সলজ্জ ভঙ্গিতে তাঁর পেছনেই দণ্ডায়মান রয়েছে। তিনি তার হাত ধরে ভিতরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। এদিকে কন্যাটি লজ্জা শরমের আতিশয্যে মাটিতে পড়ে গেল। আমি দরজা খুব

ভাল করে বন্ধ করে দিলাম। অতঃপর যে পেয়ালায় রুটি ও তেল রাখা ছিল, তা বাতির কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম, যাতে স্ত্রীর দৃষ্টিগোচর না হয়। এরপর গৃহের ছাদে উঠে প্রতিবেশীদেরকে ডাক দিলাম। সকলেই একত্রিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ ব্যাপার কি? আমি বললাম ঃ সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব আজ দিনের বেলায় তাঁর কন্যার বিবাহ আমার সাথে সম্পন্ন করেছেন। এখন রাতের বেলায় অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি তাঁর কন্যাকে এখানে রেখে গেছেন। লোকেরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল ঃ সায়ীদ তোমাকে বিবাহ করিয়েছেন? আমি বললাম ঃ হাঁ। তারা বলল ঃ তাঁর কন্যা এখন তোমার গৃহে? আমি বললাম ঃ হাঁ। অতঃপর তারা সকলেই তার কাছে গেল। আমার মা সংবাদ পেয়ে এলেন এবং বললেন ঃ তিন দিন পর্যন্ত তুই বউ মাকে স্পর্শ করতে পারবি না। যদি করিস কখনও তোর মুখ দেখব না। এই তিন দিনে আমরা তাকে ঠিক করে নেব। মায়ের আদেশমত আমি তিন দিন আলাদা রইলাম। এরপর যখন তাকে দেখলাম, তখন পরমাসুন্দরী, কালামুল্লাহর হাফেয, সুন্নতের আলেম এবং স্বামীর হক সম্পর্কে বেশ ওয়াকিফহাল পেলাম। একমাস পর্যন্ত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব আমার গৃহে এলেন না এবং আমিও তাঁর কাছে গেলাম না। একমাস পর যখন গেলাম, তখন তিনি ভক্তদের বৃত্তের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি সালাম করলে তিনি শুধু জওয়াব দিলেন এবং কিছু বললেন না। ভক্তদের প্রস্থানের পর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার স্ত্রীর অবস্থা কি? আমি বললাম ঃ খুব ভাল। তিনি বললেন ঃ মর্জির খেলাফ কোন কিছু পেলে লাঠি দিয়ে খবর নেবে। আমি গৃহে চলে এলাম। এরপর তিনি বিশ হাজার দেরহাম আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এ ছিল সেই কন্যা, যাকে খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তার খেলাফত কালে আপন পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব অস্বীকৃত হন। এরপর খলীফা মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে একশ' বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং কনকনে শীতের মধ্যে এক কলসী ঠাণ্ডা পানি তাঁর গায়ে ঢেলে দেন। এছাড়া কম্বলের কোর্তাও পরিধান করান। এসব কারণে কন্যাকে রাতেই স্বামী গৃহে বিদায় দেয়া পূর্ণ ধার্মিকতা ও সাবধানতার পরিচায়ক ছিল। (আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।)

যিনা ও কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা

জানা উচিত, লজ্জাস্থানের খাহেশ সর্বাধিক প্রবল এবং উত্তেজনার মুহূর্তে জ্ঞান-বুদ্ধির সর্বাধিক অবাধ্য। এর ফলাফল খুবই লজ্জাজনক।

মানুষ যে এ খাহেশ থেকে বেঁচে থাকে, তার কারণ হয় অক্ষমতা, না হয় লোকনিন্দার ভয়, না হয় লজ্জা শরম, না হয় মান-ইযযত রক্ষা করা। এগুলোর মধ্যে কোনটিতেই সওয়াব নেই। কারণ, এতে মনের এক আনন্দকে অন্য আনন্দের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয় মাত্র। হাঁ, এসব বাধার মধ্যেও একটি ফায়দা আছে। তা হচ্ছে, মানুষ গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, তা যে কোন কারণেই বেঁচে থাকুক। কিন্তু উচ্চ মর্তব্য ও সওয়াব তখন অর্জিত হবে, যখন সকল প্রকার সামর্থ্য সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেউ শুধু আল্লাহর ভয়ে যিনা থেকে বিরত থাকে, বিশেষতঃ যখন সত্যিকার খাহেশ বিদ্যমান। এটা সিদ্দীকগণের স্তর। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَكَتَمَ فَهُوَ شَهِيدٌ -যে আশেক হয়ে সাধু থাকে এবং এশক গোপন রাখে, অতঃপর মারা যায়, সে শহীদ। তিনি আরও বলেন ঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন। সেদিন অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন সে ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপবতী নারী নিজের দিকে আহ্বান করে, সে জওয়াবে বলে ঃ

إِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -আমি বিশ্বপালক আল্লাহকে ভয় করি। সামর্থ্য এবং আগ্রহ সত্ত্বেও যুলায়খার সাথে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কিস্সা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আল্লাহ তা'আলা পাক কালামে এ জন্যে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ ব্যাপারে হযরত ইউসুফ (আঃ) সকল সৎ ও সাধু পুরুষের ইমাম। সাহাবী হযরত সোলায়মান ইবনে ইয়াসার (রাঃ) অসাধারণ সুশ্রী যুবক ছিলেন। তাঁর গৃহে জনৈকা মহিলা আগমন করে তাঁর সাথে কুকর্ম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি অস্বীকার করেন এবং গৃহ থেকে পালিয়ে যান। তিনি রাত্রে স্বপ্নে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখে আরজ করলেন ঃ আপনি ইউসুফ? উত্তর হল ঃ হাঁ, আমি সেই ইউসুফ, যে ইচ্ছা করেছিল, আর তুমি সেই সোলায়মান, যে ইচ্ছাও করেনি। এই সাহাবীরই আর একটি আশ্চর্যজনক কাহিনী বর্ণিত আছে। তা হচ্ছে, একবার একজন সঙ্গীসহ তিনি মদীনা থেকে হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁর সঙ্গী কিছু কেনাকাটা করার জন্যে বাজারে চলে গেল। তিনি তাঁবুতে একাকী বসে রইলেন। জনৈকা বেদুঈন মহিলার দৃষ্টি তাঁর অনন্য রূপ সৌন্দর্যের উপর পতিত হতেই সে মনে প্রাণে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে গেল এবং পাহাড়

থেকে নেমে একেবারে তাঁর সামনে এসে দণ্ডায়মান হল। মহিলা নিজেও রূপ-সৌন্দর্যে ছিল চন্দ্র-সূর্যবৎ অপরূপা। সে বোরকা উত্তোলন করে চন্দ্র-সূর্যের সংযোগ ঘটাতে বিলম্ব করল না। অতঃপর সে বলল ঃ আমাকে কিছু দিন। সোলায়মান মনে করলেন, খাবার চাইছে, তাই রুটি দেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। সে বলল ঃ আমি এটা চাই না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা হয়, আমি তাই কামনা করি। তিনি বললেন ঃ তোমাকে শয়তান আমার কাছে পাঠিয়েছে। অতঃপর তিনি আপন মস্তক দুই হাঁটুর মাঝখানে রেখে সজোরে ক্রন্দন শুরু করে দিলেন। মহিলা তাঁর এই করুণ অবস্থা দেখে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে আপন গৃহে চলে গেল। সঙ্গী বাজার থেকে ফিরে এসে দেখল, কাঁদতে কাঁদতে সোলায়মানের চক্ষুদ্বয় ফুলে গেছে এবং কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে গেছে। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতে চাইলেন। বললেন ঃ কিছুই নয়। আমার কন্যার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গী বলল ঃ না, ব্যাপার অন্যকিছু। তিন মনযিল পথ অতিক্রম করার সময় তো আপনার কন্যার কথা একবারও মনে পড়ল না। আজ হঠাৎ মনে পড়বে কেন? মোট কথা, অনেক পীড়াপীড়ি করে জিজ্ঞেস করার পর সোলায়মান বেদুঈন মহিলার ঘটনা বলে দিলেন। সঙ্গী বাজার সওদার থলে রেখে অঝোরে কান্না শুরু করে দিল। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমার কান্নার কারণ হচ্ছে, যদি আপনার স্থলে আমি থাকতাম তবে সবর করতে পারতাম না, গোনাহে লিপ্ত হয়ে যেতাম। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই কাঁদলেন। অতঃপর তাঁরা মক্কায় পৌঁছলেন। তওয়াফ ও সায়ীর পর যখন তাঁরা হাজারে আসওয়াদের কাছে এলেন, তখন সোলায়মান ইবনে ইয়াসার উপবিষ্ট অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্নে জনৈক দীর্ঘদেহী, সুশ্রী, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিহিত, আতরমাখা ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ আমি ইউসুফ। সোলায়মান আরজ করলেন ঃ যুলায়খার সাথে আপনার আচরণ খুবই বিস্ময়কর। ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ আবওয়ার মহিলার সাথে তোমার আচরণ আরও বেশী আশ্চর্যজনক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি, প্রাচীনকালে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়েছিল। তারা রাতের বেলায় একটি গুহায় অবস্থান গ্রহণ করে। ঘটনাক্রমে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে গুহার মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল। তারা একে অপরকে বলল ঃ আপন আপন সৎকর্ম

স্মরণ করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া কর। সৎকর্মের বরকতে এই পাথর সরে যেতে পারে। সেমতে তাদের একজন হাত তুলে বলল ঃ ইলাহী, তুমি জান, আমার পিতামাতা বৃদ্ধ ছিলেন। আমি সন্ধ্যায় প্রথমে তাদেরকে আহার করিয়ে দিতাম, এরপর সন্তান-সন্ততি ও গৃহপালিত গবাদিপশুকে আহার দিতাম। একদিন গবাদিপশুর খাদ্য যোগাড় করতে বিলম্ব হওয়ায় আমি দেরীতে বাড়ী পৌঁছলাম। অতঃপর গাভীর দুধ দোহন করে তা পিতামাতার কাছে নিয়ে দেখি, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডেকে জাগানো আমি ভাল মনে করলাম না। তাই দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে আমি পর্যন্ত তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলাম। সন্তানরা আমার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে; কিন্তু আমি পিতামাতার পূর্বে তাদেরকে খাবার দেয়া ভাল মনে করিনি। সকালে যখন তারা পান করলেন, তখন অন্যদেরকে দিলাম। ইলাহী, যদি তুমি জান, এ কাজ আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যে করেছি, তবে এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। এ দোয়ার বরকতে পাথরটি এই পরিমাণ সরে গেল যে, আকাশ দৃষ্টিগোচর হল। দ্বিতীয় জন দোয়ায় বলল ঃ ইলাহী, তুমি জান, আমি আমার পিতৃব্য-কন্যার প্রতি আশেক ছিলাম। আমি তার কাছে মিলনের বাসনা প্রকাশ করলে সে অস্বীকৃতি জানাল। এরপর দুর্ভিক্ষের সময় নিদারুণ কষ্টে পড়ে সে আমার কাছে আগমন করল। সে অস্বীকার করবে না। আমি তাকে এই শর্তে একশ' বিশটি স্বর্ণমুদ্রা দিলাম। সে আমার কথা মেনে নিল; কিন্তু আমি যখন তার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হতে চাইলাম, তখন বলল ঃ আল্লাহকে ভয় কর। আমার বেইজ্জতী করো না। এতে আমি ভীত হয়ে পড়লাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। তাকে যা দিয়েছিলাম, তাও ফেরত নিলাম না। ভালবাসাও যথারীতি কায়েম রাখলাম। ইলাহী, যদি আমি কেবল তোমার ভয়ে এ কাজ করে থাকি, তবে এর বরকতে এ বিপদ দূর করে দাও। এরপর পাথরটি আরও সামান্য সরে গেল। কিন্তু বের হওয়ার পথ হল না তৃতীয় জন বলল ঃ ইলাহী, আমি একবার কয়েকজন মজুরকে কাজে নিয়োগ করেছিলাম এবং সকলের মজুরিই শোধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু জনৈক মজুর তার মজুরি রেখেই চলে গেল। তার অনুপস্থিতিতে আমি তার অর্থ কারবারে নিয়োগ করায় তা বেড়ে অনেক হয়ে গেল। অনেক দিন পর যখন সে মজুরি চাইতে এল, তখন আমি অনেকগুলো উট, গরু ও ছাগল দেখিয়ে বললাম ঃ এগুলো সব তোমার। সে বলল ঃ আপনি আমার সাথে ঠাট্টা মস্করা করছেন? আমি বললাম ঃ ঠাট্টা নয়। এগুলো তোমার মজুরির অর্থ দিয়ে ব্যবসা করে অর্জিত হয়েছে। এগুলো নিয়ে

যাও। সে জন্তুগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল এবং কিছুই রেখে গেল না। ইলাহী, যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্যে করে থাকি, তবে আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর। তার এই দোয়ার পর পাথরটি সম্পূর্ণ সরে গেল এবং তারাও গন্তব্য পথে রওয়ানা হয়ে গেল। যে নিজেকে যিনা থেকে বাঁচিয়ে রাখে তার হচ্ছে এই ফযীলত। তারই নিকটবর্তী সে ব্যক্তি, যে চোখের যিনা থেকে নিরাপদ থাকে। কেননা, যিনার সূচনা চোখ দ্বারাই হয়। তাই চোখ সংযত রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও দুরূহ কাজ। কিন্তু একে হালকা মনে করা হয়, তেমন ভয় করা হয় না। অথচ সব বিপদের উৎসমূল হচ্ছে চোখ। যদি ইচ্ছা ব্যতিরেকে একবার দেখা হয়, তবে তার জন্যে শাস্তি নেই; কিন্তু পুনর্বার দেখার মধ্যে শাস্তি আছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ-

لَكَ الْأُوْلَى وَعَلَيْكَ الثَّانِيَةُ –প্রথম বার দেখা তোমার জন্যে জায়েয এবং দ্বিতীয় বার দেখা বিপদ।

এখানে চোখের দেখাই উদ্দেশ্য। আলা ইবনে যিয়াদ বলেন ঃ নারীর চাদরের উপরও দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। কেননা, দৃষ্টি অন্তরে খাহেশের বীজ বপন করে। মানুষ যখন কোন নারীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন দ্বিতীয় বার না তাকানোটা খুবই বিরল। রূপের ধারণা দৃষ্টিতে থাকলে দ্বিতীয় বার দেখতে মন চাইবে। তখন নিজের মনে সাব্যস্ত করে নেবে যে, পুনর্বার দেখা নিছক বোকামি। কেননা, দ্বিতীয় বার দেখলে যদি মুখমণ্ডল ভাল মনে হয়, তবে নফসে খাহেশ হবে, অথচ সে পাওয়ার নয়। অতএব পরিতাপ ছাড়া আর কি হাতে আসবে। আর যদি মুখমন্ডল বিশ্রী মনে হয় তবে যে উদ্দেশে দেখা; অর্থাৎ আনন্দ লাভ, তা অর্জিত হবে না। কেবল মজাবিহীন গোনাহে লিপ্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি না তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে নেয়া হয় তবে মনের উপর থেকে অনেক বিপদ টলে যায়। চোখের ত্রুটির পর যদি কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজেকে যিনা থেকে বাঁচিয়ে নেয়, তবে এটা বড় শক্তিমত্তা ও অসাধারণ তওফীকের কাজ হবে। আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ মুযানী রেওয়ায়াত করেন, জনৈক কসাই তার প্রতিবেশীর বাঁদীর প্রতি আশেক হয়ে যায়। বাঁদীর মালিক তাকে কার্যোপলক্ষে অন্য গ্রামে প্রেরণ করলে কসাই তার পিছু নেয় এবং আপন কুমতলব প্রকাশ করে। বাঁদী বলল ঃ যতটুকু তুমি আমাকে চাও আমি তার চেয়ে বেশী তোমাকে চাই। কিন্তু অপকর্ম থেকে আমাকে মাফ কর। কারণ, আমি আল্লাহকে ভয় করি। কসাই বলল ঃ তুমি আল্লাহকে ভয়

করলে আমি করব না কেন? অতঃপর সে তওবাকারী হয়ে বাড়ীর পথে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে সে দারুণ পিপাসায় মরণোন্মুখ হয়ে পড়ল। এমন সময় বনী ইসরাঈলের একজন পয়গম্বরের দূতের সাথে তার সাক্ষাৎ হল। দূত অবস্থা জিজ্ঞেস করলে সে পিপাসার কথা জানাল। দূত বলল ঃ আমি তুমি মিলে দোয়া করি, যাতে গ্রামে পৌঁছা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মেঘমালা দ্বারা আমাদেরকে ছায়া দান করেন। কসাই বলল ঃ দোয়া করার মত কোন নেক কাজ আমি করিনি। তুমিই দোয়া কর। দূত বলল ঃ আচ্ছা, আমিই দোয়া করি। তুমি কেবল 'আমীন' বলবে। অতঃপর দূত দোয়া আরম্ভ করল এবং কসাই আমীন বলে গেল। অবশেষে এক খণ্ড মেঘ তাদের মাথার উপর চলতে লাগল এবং তার গ্রামে পৌছে গেল। কসাই যখন আলাদা হয়ে তার গৃহের দিকে চলতে লাগল, তখন মেঘখণ্ডটিও তার সাথে যেতে লাগল। দূত বলল ঃ তুমি তো বলছিলে, তোমার কোন নেক আমল নেই। তাই আমি দোয়া করেছিলাম। এখন মেঘখণ্ড তোমার সাথে চলল কিরূপে? তোমার অবস্থা আমাকে খুলে বল। কসাই তওবার ঘটনা বর্ণনা করলে দূত বলল ঃ আল্লাহর কাছে তওবাকারীর এমন মর্তবা, যা অন্য কারও নেই।

আহমদ ইবনে সায়ীদ তাঁর পিতার বাচনিক বর্ণনা করেন– কুফায় আমাদের কাছে একজন সুগঠন, সুশ্রী ও সৎস্বভাবের আবেদ বসবাস করত। তিনি বেশীর ভাগ সময় মসজিদেই অতিবাহিত করতেন। জনৈকা রূপসী বুদ্ধিমতী মহিলা তাঁকে দেখে প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত প্রেম অন্তরে গোপন রাখল। একদিন আবেদ যখন মসজিদে গমন করছিলেন, তখন মহিলা তাঁর পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল ঃ আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই, প্রথমে তা শুনে নিন, এরপর মনে যা চায় করুন। কিন্তু আবেদ কিছুই না বলে সোজা চলে গেলেন। ঘরে ফেরার পথে মহিলা আবার তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল এবং বলল ঃ আমার কথা শুনে যান। আবেদ মথা নত করল এবং অনেকক্ষণ পর বলল ঃ এটা অপবাদের জায়গা। কেউ আমাকে অপবাদ দিক, আমি তা ভাল মনে করি না। মহিলা বলল ঃ আমি আপনার অবস্থা না জেনে এখানে দাঁড়াইনি। খোদা না করুন, কেউ আমার পক্ষ থেকে খারাপ কিছু জানুক। কিন্তু এহেন কাজে আমার নিজেরই আসতে হল। আমি জানি, মানুষ তিলকে তাল বানায়। আপনারা আবেদ সম্প্রদায় আয়নার মত। সামান্য বিষয়েই আপনাদের গায়ে দোষ লেগে যায়। আমার একশ' কথার এক কথা হল, আমি আপনার প্রতি প্রেমাসক্ত। এখন আমার আপনার ব্যাপারটি আল্লাহ

তা'আলাই নিষ্পত্তি করুন। যুবক আবেদ এ কথা শুনে গৃহে চলে গেলে। তিনি দিশেহারা অবস্থায় নামায পড়তে চাইলেন; কিন্তু পারলেন না। অবশেষে এক চিরকুট লেখে গৃহ থেকে বের হয়ে পড়লেন। দেখলেন, মহিলা পথিমধ্যে পূর্বের জায়গায়ই দণ্ডায়মান আছেন। তিনি চিরকুটটি মহিলার দিকে নিক্ষেপ করে আপন গৃহে ফিরে এলেন– চিরকুটের বিষযবস্তু ছিল এই ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হে নারী! জেনে রাখ, যখন বান্দা আল্লাহর নাফরমানী করে, তখন আল্লাহ সহ্য করেন। যখন পুনর্বার করে তখনও দোষ গোপন রাখেন। কিন্তু যখন গোনাহে গা ভাসিয়ে দেয় তখন এমন গযব নাযিল করেন, যা পৃথিবী, আকাশ, পাহাড় ও বৃক্ষলতা কোন কিছুই সহ্য করতে পারে না। সুতরাং এমন গযব সহ্য করার ক্ষমতা কার? তুমি যে কথা বলেছিলে, তা যদি মিথ্যা হয়, তবে সেদিনকে স্মরণ কর যখন আকাশমণ্ডলী গলিত তামার আকার ধারণ করবে, পাহাড়-পর্বত ধুনা তুলার মত হবে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্রোধ ও প্রতাপ এমন প্রচণ্ড হবে যে, সকল মানুষ হাঁটু গেড়ে পড়ে থাকবে। আমার অবস্থা হচ্ছে, আমি নিজেকে সংশোধন করতে অক্ষম। পক্ষান্তরে যদি আমার উক্তি সত্য হয়, তবে এমন চিকিৎসকের সন্ধান দিচ্ছি, যিনি সকল ব্যথা নিরাময় এবং মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসা করবেন। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ জাল্লা শানুহু। খাঁটি মনে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্যে এ আয়াতটিই যথেষ্ট ঃ

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ -

–তাদেরকে সতর্ক করে দিন আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন কষ্টের কারণে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। জালেমদের জন্যে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই এবং সুপারিশ গ্রাহ্য হয় এমন কোন সুপারিশকারীও নেই। চোখের অপব্যবহার এবং অন্তরের গোপন বিষয় আল্লাহ জানেন।

এ আয়াত থেকে পলায়নের উপায় নেই। ইতি-

কয়েকদিন পরে এই মহিলা আবার এসে পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হল। আবেদ তাকে দূর থেকে দেখেই গৃহপানে ফিরে যাবার ইচ্ছা করলেন।

মহিলা বলল ঃ চলে যান কেন? আজই শেষ সাক্ষাৎ। এরপর আল্লাহ তা'আলার কাছেই দেখা হবে। এরপর সে খুব কান্নাকাটি করল এবং বলল ঃ যে আল্লাহর হাতে আপনার প্রাণ, আমি তাঁর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আপনার সমস্যাটি আমার জন্যে সহজ করে দেন। কিন্তু আমাকে কোন উপদেশ দিন। আবেদ বললেন ঃ নিজেকে নফসের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখ এবং এ আয়াতটি মনে রেখ ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ -

তিনিই তোমাদেরকে রাতের বেলায় ওফাত দেন এবং দিনে যা কর, তা জানেন।

মহিলা আঁচলে মুখ লুকিয়ে প্রথম বারের চেয়েও অধিক কান্না শুরু করল। এরপর আপন গৃহে চলে গেল। কয়েকদিন আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকার পর সে দুঃখেই ইন্তেকাল করল। আবেদ তাকে স্মরণ করে কাঁদত। লোকেরা জিজ্ঞেস করত ঃ আপনিই তো তাকে নিরাশ করেছেন। এখন কাঁদেন কেন? আবেদ বলতেন, সূচনাতেই তাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর কাছে নিজের জন্যে ভাণ্ডার করেছি। এখন তা বিনষ্ট হয় কি না, তাই ভেবে কাঁদি।

দ্বাদশ অধ্যায়

জিহ্বার বিপদাপদ

প্রকাশ থাকে যে, জিহ্বা একটি মাংসখণ্ড হলেও এটি আল্লাহ তা'আলার বড় বড় নেয়ামতসমূহ এবং সূক্ষ্ম কারিগরিসমূহের অন্যতম। এর গোনাহ যেমন সর্বাধিক বেশী, তেমনি এর আনুগত্যও সর্বোপরি। কেননা, হীনতম ঔদ্ধত্য তথা কুফর এবং শ্রেষ্ঠতম আনুগত্য তথা ঈমান এই জিহ্বার সাক্ষ্য দ্বারাই বিকশিত হয়। এছাড়া প্রত্যেক বস্তু– তা অনুপস্থিত হোক অথবা উপস্থিত, স্রষ্টা হোক অথবা সৃষ্টি, জানা হোক অথবা অজানা, বাহ্যিক হোক অথবা আভ্যন্তরীণ, সমস্তই জিহ্বায় উচ্চারিত হয়। উদাহরণতঃ জ্ঞান যে বস্তুকে বেষ্টন করে, জিহ্বাই তা বর্ণনা করে– সত্য হোক অথবা মিথ্যা। জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই নেই। এটি এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা জিহ্বা ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না। উদাহরণতঃ চক্ষু রঙ্গিন বস্তুর আকৃতি ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পারে না। কান আওয়াজ ব্যতীত অন্য কিছু শুনে না। অন্যান্য অঙ্গের অবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু জিহ্বার কর্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত। এর কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি তার জিহ্বাকে বশে রাখে না, শয়তান তাকে দিয়ে অনেক কিছু বলাতে পারে এবং তাকে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করতে পারে। সহীহ্ হাদীসে আছে ঃ

وَلَايَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ ـ

-জিহ্বার ফসলই মানুষকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করে।

হাঁ, জিহ্বার অনিষ্ট থেকে সে ব্যক্তিই বেঁচে থাকবে, যে তাকে শরীয়তের লাগাম পরাবে এবং মুখ দিয়ে সেই কথাই বের করবে, যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের উপকার নিহিত থাকে। কোন্ কথা বলা ভাল এবং কোন্টি মন্দ, তা জানা খুবই দুষ্কর এবং তা আমলে আনা আরও কঠিন। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়ে জিহ্বাই মানুষের জন্যে অধিক নাফরমান। কেননা, এটি সঞ্চালন করা খুবই সহজ। জিহ্বার বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং তার ক্ষতিকে ভয় করার ব্যাপারে মানুষ মোটেই তৎপরতা প্রদর্শন করে না। অথচ এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে শয়তানের একটি বড় হাতিয়ার। তাই নিম্নে আমরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে ও তওফীকে জিহ্বার সমস্ত বিপদাপদ একটি একটি করে সংজ্ঞা, কারণ ও আত্মরক্ষার উপায়সহ সবিস্তার উল্লেখ করব।

জিহ্বার বিপদাশংকা ও চুপ থাকার ফযীলত

জানা উচিত, জিহ্বার কারণে বিপদাশংকা অনেক বড় এবং এ থেকে আত্মরক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে চুপ থাকা। এ কারণেই শরীয়তে চুপ থাকার প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদান লক্ষ্য করা যায়। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন– مَنْ صَمَتَ نَجَا -যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়। তিনি আরও বলেন– اَلصَّمْتُ حِكْمَةٌ وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهٗ –চুপ থাকা প্রজ্ঞা ও সাবধানতা। কিন্তু কম লোকই চুপ থাকে। আবদুল্লাহ্ ইবনে সুফিয়ানের পিতা রেওয়ায়াত করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম ঃ ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দিন, যেন আপনার পরে কারও কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়। তিনি বললেন ঃ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ –বল, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম; এরপর সরল পথে কায়েম থাক। আমি আরজ করলাম ঃ আমি কি বিষয় থেকে বেঁচে থাকব? তিনি জিহ্বার দিকে হাতে ইশারা করে বললেন ঃ এ থেকে বেঁচে থাক। ওকবা ইবনে আমের বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম ঃ মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন ঃ

اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ ـ

–জিহ্বাকে সংযত রাখ, গৃহে থাক এবং গোনাহের জন্যে ক্রন্দন কর।

তিনি আরও বলেন ঃ যে আমাকে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব। অন্য এক হাদীসে আছে– যে ব্যক্তি উদর, লজ্জাস্থান ও জিহ্বার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকে, সে সকল অনিষ্ট থেকেই নিরাপদ থাকে। কেননা, অধিকাংশ লোক এ তিনটি খাহেশ দ্বারাই বিপন্ন হয়। রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন বিষয়ের কারণে মানুষ অধিক পরিমাণে জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্রতার কারণে। আবার প্রশ্ন করা হল, কোন্ বিষয়ের কারণে বেশীর ভাগ লোক জাহান্নামে যাবে? তিনি বললেন ঃ

اَلْاَجْوَفَانِ اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ

–দুটি খালি বস্তুর কারণে- মুখ ও লজ্জাস্থান।

এখানে মুখের অর্থ জিহ্বার বিপদাপদও হতে পারে। কেননা মুখ

জিহ্বার পাত্র এবং মুখের অর্থ পেটও হতে পারে। কেননা, পেট ভরার পথ মুখই। হযরত মুয়ায (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন ঃ সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি আপন জিহ্বা বের করে তার উপর অঙ্গুলি রাখলেন; অর্থাৎ চুপ থাকা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। সায়ীদ ইবনে জোবায়রের রেওয়ায়াতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন সকাল হয়, তখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তুমি সোজা থাকলে আমরাও সোজা থাকব। আর তুমি বক্র হলে আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হবে। হযরত ওমর (রাঃ) একবার হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে আপন জিহ্বা ধরে টানতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে নায়েবে রসূল, আপনি এ কি করছেন? তিনি বললেন ঃ সে আমাকে অনেক নাকানি-চুবানি খাইয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ দেহের মধ্যে এমন কোন অঙ্গ নেই, যে আল্লাহর কাছে জিহ্বার ক্ষিপ্রতার অভিযোগ করে না। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে বলতেন ঃ

يَا لِسَانُ قُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍّ تَسْلَمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَنْدَمْ ـ

–হে জিহ্বা, ভাল কথা বল, গনীমত পাবে এবং অনিষ্ট থেকে অনুতপ্ত হওয়ার পূর্বে চুপ কর, বিপদমুক্ত থাকবে।

লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা আপনি নিজের পক্ষ থেকে বলছেন? তিনি বললেন ঃ না। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– বনী আদমের অধিকাংশ গোনাহ্ তার জিহ্বার মধ্যে। হযরত ওমর (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেন-

مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ وَقَاهُ اللّٰهُ عَذَابَهُ وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلَى اللّٰهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهُ ـ

–যে জিহ্বা সংযত রাখে আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখেন, যে ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ তাকে আযাব থেকে রক্ষা করেন; যে আল্লাহর সামনে ওযর পেশ করে, আল্লাহ তার ওযর কবুল করেন।

হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ يَسْكُتْ ـ

–যে আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর খেদমতে লোকেরা আরয করল ঃ এমন আমল বলে দিন, যদ্দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায়। তিনি বললেন ঃ কখনও কথা বলো না। লোকেরা বলল ঃ

এটা তো অসম্ভব। তিনি বললেন ঃ ভাল কথা ছাড়া মুখ থেকে কিছু বের করো না। হযরত সোলায়মান (আঃ) বলেন ঃ যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে কথা বলা রূপা হয়, তবে চুপ থাকা স্বর্ণ হবে। এক হাদীসে আছে, মুমিনের জিহ্বা অন্তরের পেছনে থাকে। কথা বলার আগে অন্তরে চিন্তা করে, এর পর কথা বলে। মোনাফেকের জিহ্বা অন্তরের অগ্রে থাকে। সে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যা মনে চায় বলে দেয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) কথা থেকে বিরত থাকার জন্যে মুখে কংকর রাখতেন। তিনি জিহ্বার দিকে ইশারা করে বলতেন, সে আমাকে অনেক অধঃপতিত করেছে। হযরত তাউস (রঃ) বলেন ঃ আমার জিহ্বা হিংস্র জন্তু। ছেড়ে দিলে আমাকে গিলে ফেলবে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর দরবারে লোকজন কথা বলছিল; কিন্তু আহনাফ ইবনে কায়স (রাঃ) চুপচাপ বসেছিলেন। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ আপনি কিছুই বলছেন না কেন? তিনি বললেন ঃ যদি মিথ্যা বলি, আল্লাহর ভয় লাগে, আর যদি সত্য বলি, তবে তোমার ভয় লাগে। এগুলো হচ্ছে চুপ থাকার ফযীলত।

চুপ থাকা যে শ্রেষ্ঠ এর কারণ, কথা বলার মধ্যে শত শত বিপদাশংকা থাকে। ভুল, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, রিয়া, কপটতা, নির্লজ্জতা, কথা কাটাকাটি, আত্মপ্রশংসা, বাড়িয়ে বলা, হ্রাস করা, অপরকে কষ্ট দেয়া, গোপন বিষয় ফাঁস করা ইত্যাদি সব গর্হিত কর্ম জিহ্বার কারণেই হয়ে থাকে। জিহ্বা সঞ্চালন কঠিন মনে হয় না; এর অন্তরে স্বাদ অনুভূত হয়। কথা বলায় অভ্যস্ত ব্যক্তি জিহ্বা বশে রাখবে, যেখানে বলা দরকার সেখানেই বলবে এবং যে কথা বলা উচিত নয়, তা থেকে বিরত থাকবে এটা খুবই বিরল। কেননা, কোন্ কথা বলার যোগ্য এবং কোন্‌টি যোগ্য নয়, তা জানা খুবই কঠিন। তাই কথা বলার মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে। এছাড়া চুপ থাকার আরও কিছু ফায়দা আছে। তা হচ্ছে, এতে সাহস সংহত থাকে, ভয়ভীতি কায়েম থাকে এবং যিকির ও এবাদতের জন্যে অবসর হাতে আসে। চুপ থাকলে কথা বলার বিপদ থেকে দুনিয়াতে মুক্তি অর্জিত হয় এবং পরকালে হিসাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد

–মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লেখার জন্যে তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে।

চুপ থাকা যে উত্তম, এর যৌক্তিক প্রমাণ হচ্ছে, কথা চার প্রকার। এক, যার মধ্যে ক্ষতিই ক্ষতি নিহিত। দুই, যার মধ্যে উপকারই উপকার নিহিত। তিন, যার মধ্যে ক্ষতি ও উপকার উভয়টি নিহিত। চার, যার মধ্যে ক্ষতিও নেই উপকারও নেই। প্রথম প্রকার কথার ক্ষেত্রে চুপ থাকা জরুরী। তৃতীয় প্রকারে যদি উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশী হয়, তবে তাতেও চুপ থাকা জরুরী। চতুর্থ প্রকার কথা বলা অযথা সময় নষ্ট করার নামান্তর। সুতরাং বলার যোগ্য একমাত্র দ্বিতীয় প্রকার কথাই রয়ে গেল। শব্দান্তরে কথার এক চতুর্থাংশ কথা বলাও বিপন্মুক্ত নয়। কেননা এতে কতক গোপন বিপদ যেমন রিয়া, লৌকিকতা, আত্মপ্রীতি, গীবত, চোগলখোরী ইত্যাদি মিশ্রিত হয়ে যায়। বক্তা টেরও পায় না। তাই কথা বলার মধ্যে সর্বদা বিপদাশংকা লেগেই থাকে। যে ব্যক্তি আমাদের বিশদ বর্ণনা অনুযায়ী কথা সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে যাবে, সে নিশ্চিতরূপেই হৃদয়ঙ্গম করবে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 'যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়' উক্তিটি কতদূর সঠিক। এক্ষণে আমরা কথা সংশ্লিষ্ট বিপদের ধারাবাহিক বর্ণনা শুরু করছি।

অনর্থক কথাবার্তা ঃ যে কথা না বললে কোন গোনাহ্ হয় না এবং জান-মালেরও কোন ক্ষতি হয় না, তাই অনর্থক কথা। মানুষের সর্বোত্তম অবস্থা হচ্ছে, সে কথা বলার সময় লক্ষ্য রাখবে যেন তার সবগুলো কথা গীবত, চোগলখোরী, মিথ্যা, বিবাদ-বিসম্বাদ ইত্যাদি বিপদ থেকে মুক্ত থাকে। সে কেবল এমন কথাই মুখে উচ্চারণ করবে, যা শরীয়ত অনুমোদিত এবং যাতে তার নিজের ও কোন মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি না হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু অনাবশ্যক কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়ে যায়। এতে একদিকে সময় নষ্ট হয়, অপর দিকে জিহ্বার হিসাব ঘাড়ে চাপে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে উৎকৃষ্ট বস্তু হাতছাড়া হয়ে যায়। কেননা, কথা বলার সময় যদি কেউ চিন্তাভাবনায় ব্যাপৃত হয় তবে অদৃশ্য জগত থেকে এমন বিষয়ও প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যার উপকার বেশী অথবা তসবীহ্ কিংবা অন্য কোন যিকিরেও মশগুল হওয়া যায়। অবশ্যই বহু কথা এমন আছে, যেগুলোর কারণে জান্নাতে গৃহ নির্মিত হয়। সুতরাং

ধনভাণ্ডার সঞ্চয় করার ক্ষমতা যার আছে, সে যদি এর বিনিময়ে ঢিলা সঞ্চয় করে, তবে একে ক্ষতি ছাড়া আর কি বলা হবে? অতএব আল্লাহর যিকির, যা উৎকৃষ্ট ধনভান্ডার, তা ছেড়ে অনাবশ্যক কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করাও তেমনি ক্ষতির কাজ, যদিও তা উচ্চারণ করা মোবাহ্ তথা অনুমোদিত হয়। ঈমানদারের চুপ থাকা চিন্তাভাবনা, কথা বলা যিকির এবং দেখা শিক্ষা গ্রহণ হয়ে থাকে। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ মানুষের পুঁজি হচ্ছে সময়। এ সময় অনাবশ্যক কথায় ব্যয় করলে এবং সওয়াব ও আখেরাতে সম্বল অর্জন না করলে পুঁজি বিনষ্ট হতে বাধ্য। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন–

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيهِ

–ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে এমন বিষয় বর্জন করা, যা উপকারী নয়।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে এ বিষয়টি আরও কঠোর ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ ওহুদ যুদ্ধে জনৈক যুবক শহীদ হলে আমরা দেখলাম, ক্ষুধার কারণে তার পেটে পাথর বাঁধা রয়েছে। তাঁর মাতা মুখ থেকে মাটি মুছে দিয়ে বলল ঃ বৎস! জান্নাত মোবারক হোক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কিরূপে জানা গেল, সে জান্নাতে যাবে? সম্ভবতঃ সে অনর্থক কথাবার্তা বলত। অন্য এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত কা'বকে কয়েকদিন না দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কা'ব কোথায়? লোকেরা বলল ঃ অসুস্থ। তিনি তাঁকে দেখতে গেলেন। কাছে গিয়ে বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ হে কা'ব। কা'বের মাতা বললেন ঃ তোমাকে বেহিসাব জান্নাত মোবারক হোক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র উপর আদেশ জারি করে কে এই মহিলা? কা'ব আরজ করলেন, আমার জননী । তিনি বললেন ঃ তুমি কিরূপে জানলে? তোমার পুত্র হয় তো কখনও অনর্থক কথাবার্তা বলেছে। এই হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যার যিম্মায় কোন হিসাব নেই সে-ই বেহিসাব জান্নাতে যেতে পারে। যে অনাবশ্যক কথা বলে, তার যিম্মায় হিসাব থেকে যায়, যদিও সে কথা মোবাহ্ হয়।

অধিক কথা বলা ঃ এতে অনর্থক এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাও শামিল। উদাহরণতঃ যেখানে প্রয়োজনীয় কথা সংক্ষেপেও বলা যায়, সেখানে এক বাক্যের স্থলে দু'বাক্য বললে দ্বিতীয় বাক্য অতিরিক্ত হবে। গোনাহ্ অথবা ক্ষতি না হলেও এটা খারাপ। আতা ইবনে আবী রাবাহ

বলেন ঃ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ অতিরিক্ত কথা খারাপ মনে করতেন। মুতরিফ বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার প্রতাপের প্রতি লক্ষ্য রাখ। অস্থানে তাঁর উল্লেখ করো না। উদাহরণতঃ কুকুর অথবা গাধা দেখে বলো না, আল্লাহ্, একে সরিয়ে দাও।

জানা উচিত, অতিরিক্ত কথার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তবে কোরআন পাকে জরুরী কথার সীমা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ـ

–তাদেরকে অনেক পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। কিন্তু যে খয়রাত করার আদেশ করে অথবা সৎকাজ করতে বলে অথবা মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের কথা বলে, তার কথা ভিন্ন।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ সেই ব্যক্তির জন্যে সুসংবাদ, যে জিহ্বাকে বাড়তি কথা থেকে সংযত রাখে এবং বাড়তি অর্থ ব্যয় করে দেয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ এ বিষয়টিকে উল্টে দিয়েছে। তারা অতিরিক্ত অর্থ আগলে রাখে এবং জিহ্বাকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেয়। মুতরিফের পিতার বর্ণনা, তিনি আমের গোত্রের লোকদের সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রশংসা করে বলতে থাকে– আপনি আমাদের পিতা, সরদার, শ্রেষ্ঠতম এবং অনুগ্রহদাতা, আপনি এমন, আপনি এমন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ لَايَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

–তোমরা তোমাদের কথা বল, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে।

এ হাদীস থেকে জানা গেল, যখন কারও সত্য প্রশংসাও করা হয় তখন শয়তান অতিরিক্ত কথা মুখ দিয়ে বের করে দিতে পারে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত কথার ব্যাপারে সতর্ক করছি। কথা ততটুকুই বলা উচিত, যতটুকুতে প্রয়োজন মিটে যায়। হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ মানুষের সব কথা লেখা হয়। কেউ যদি শিশুকে চুপ করানোর জন্যে কোন কিছু দেয়ার কথা বলে এরপর না দেয়, তবে তাকে মিথ্যাবাদী লেখা হয়। হযরত হাসান বলেন ঃ হে মানুষ! আমলনামা খোলা রয়েছে। দু'জন ফেরেশতা তোমার আমল লেখার জন্যে নিয়োজিত আছেন। এখন ইচ্ছা হয় কম কথা বল, ইচ্ছা হয় বেশী কথা

বল। বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান (আঃ) জনৈক জ্বিনকে এক জায়গায় প্রেরণ করে কয়েকজন জ্বিনকে এই বলে তার পেছনে লাগিয়ে দিলেন, তার যা অবস্থা দেখ এবং সে যা বলে, তা এসে আমাকে বলবে। তারা ফিরে এসে বলল ঃ সে বাজারে গিয়ে আপন মস্তক আকাশের দিকে উত্তোলন করে, এরপর মানুষের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাতে থাকে। হযরত সোলায়মান (আঃ) সেই জ্বিনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এমন করছিলে কেন? জ্বিন আরজ করল, আকাশের ফেরেশতাদেরকে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, তারা মানুষের মাথার উপর বসে কত দ্রুত তাদের আমল লিপিবদ্ধ করছে। আর মানুষকে দেখেও অবাক হচ্ছিলাম, তারা কত তাড়াতাড়ি বিপথগামী হচ্ছে। হযরত ইবরাহীম তায়মী (রঃ) বলেন ঃ মুমিনের কথা বলা চিন্তাভাবনা সহকারে হয়। কিছু ফায়দা দেখলে বলে ঃ নতুবা চুপ থাকে। পক্ষান্তরে পাপাচারীর জিহ্বা দর্জির কাঁচির মত চলে। চিন্তাভাবনা ছাড়াই অনর্গল বকতে থাকে। হযরত হাসান (রঃ) বলেন ঃ যার কথা বেশী, সে বেশী মিথ্যাবাদী। যার কাছে অর্থসম্পদ বেশী, তার গোনাহ বেশী। চরিত্রহীন ব্যক্তি নিজের জন্যে আযাব টেনে আনে। ওমর ইবনে দীনার বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর মজলিসে এক ব্যক্তি দীর্ঘ কথা বললে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার জিহ্বার ওপাশে কয়টি দরজা আছে? লোকটি বলল ঃ দাঁত আছে, আর আছে ঠোঁট। তিনি বললেন ঃ এদের একটিও কি তোমার কথায় বাধা দিল না? ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব বলেন ঃ আলেমের জন্যে কথা বলার চেয়ে কথা শুনাও একটি পরীক্ষা। তাই যতক্ষণ অন্য ব্যক্তি কথা বলে, ততক্ষণ চুপ থাকা উচিত। কেননা, কথা শুনার মধ্যে নিরাপত্তা আছে– বলার মধ্যে নেই।

অবৈধ বিষয়াদি বলা ঃ অবৈধ বিষয়াদি বলাও অনর্থক কথাবার্তার মধ্যে দাখিল। পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমোক্ত দু'টি বিষয় ছিল মোবাহ্। যে কথা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া ছাড়া হারামও, এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ গোনাহের কথাবার্তা বলা, নারীর কথা বলা, শরাবের আসর ও খারাপ লোকের মজলিসের কথা বর্ণনা করা। এগুলো সব তৃতীয় প্রকারের মধ্যে দাখিল এবং নিশ্চিত রূপ নাজায়েয ও হারাম। এ বিপদটির সূচনা এভাবে হয় যে, প্রথমে অনর্থক ও অতিরিক্ত কথা বলার অভ্যাস গড়ে উঠে। এরপর আস্তে আস্তে তা হারাম আলোচনা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অনেকে চিত্তবিনোদনের জন্যে আলাপ-আলোচনায় বসে, কিন্তু তাতে কারও ইযযতের প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়, অথবা উপরোক্ত

বিষয়াদি নিয়ে কথাবার্তা হতে থাকে। বেলাল ইবনে হারেস বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার বললেন, মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির একটি কথা বলে। সে জানে না, এতে কোন বড় সন্তুষ্টি অর্জিত হবে, কিন্তু একারণে আল্লাহ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত আপন সন্তুষ্টি লেখে নেন। কখনও মানুষের মুখ দিয়ে অসন্তুষ্টির একটি কথা বের হয়ে পড়ে। সে জানে না, এতে বিরাট অসন্তুষ্টি হবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত আপন অসন্তুষ্টি লেখে নেন। হযরত আলকামা বলেন ঃ বেলাল ইবনে হারেসের এই হাদীস আমাকে অনেক কথা বলতে বাধা দেয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ -

–তাদের সাথে বসো না যে পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় না যায়। নতুবা তোমরাও তাদের সমান হয়ে যাবে।

অপরের কথার মধ্যে কথা বলা এবং বিবাদ করা ঃ হাদীস শরীফে কথার মধ্যে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– আপন ভাইয়ের কথার মধ্যে কথা বলো না এবং তার সাথে ঝগড়া করো না। তাকে এমন ওয়াদা দিয়ো না, যা পালন করবে না। এক হাদীসে বলা হয়েছে–

لَايَتَكَمَّلُ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْاِيْمَانِ حَتّٰى يَدَعَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ حَقًّا

কথার মধ্যে কথা বলা ত্যাগ না করা পর্যন্ত কোন বান্দা ঈমানের স্বরূপ পূর্ণ করে না, যদিও তা সত্য হয়। আরও বলা হয়েছে– যার মধ্যে ছয়টি অভ্যাস থাকে, সে ঈমানের স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছে যায়– (১) গরমের দিনে রোযা রাখা, (২) খোদাদ্রোহীদেরকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা, (৩) বৃষ্টি-বাদলের দিনে প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া; (৪) বিপদে সবর করা; (৫) অধিক শীতেও ওযু পূর্ণরূপে করা এবং (৬) সত্যের দিকে থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ না করা। হযরত মালেক ইবনে আনাস বলেন, ঝগড়া বিবাদ ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। তিনি আরও বলেন ঃ ঝগড়া করলে অন্তর কঠোর হয়ে যায় এবং তাতে হিংসা-বিদ্বেষের বীজ পড়ে।

মোট কথা, কথার মধ্যে কথা বলার অনিষ্ট অনেক। এর সংজ্ঞা হচ্ছে অপরের কথায় আপত্তির ছলে দোষক্রটি বের করা। এটাই বর্জনীয়। কেউ কোন কথা বললে তা যদি সত্য হয়, তবে মেনে নেয়া উচিত। আর ধর্ম

সম্পর্কিত মিথ্যা না হলে চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়। দোষ তালাশ করার কোন প্রয়োজন নেই। হাদীসে এই স্বভাব مراء বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

'খুসুমত' তথা বিবাদ ঃ এর মধ্যে এবং পূর্ববর্তী مراء -এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, অপরকে হেয় ও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার মতলবে কারও কথার মধ্যে দোষক্রটি বের করাকে বলা হয় مراء এবং অর্থসম্পদ পাওয়ার উদ্দেশে যে বিবাদ করা হয়, তাকে বলে 'খুসুমত'। এটা কখনও আপত্তি ছাড়াই এবং কখনও আপত্তি সহকারে হয়, কিন্তু مراء আপত্তি ছাড়া হয় না। এই খুসুমতও নিন্দনীয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন–

ان ابغض الرجال الى الله الد الخصم –অধিক বিবাদকারী ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার কাছে অধিক অপছন্দনীয়।

ইবনে কোতায়বা বলেন ঃ একদিন আমি বসা আছি, এমন সময় বশীর ইবনে আবদুল্লাহ আমার কাছ দিয়ে গমন করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখানে বসে আছ কেন? আমি বললাম ঃ আমার মধ্যে ও আমার চাচাত ভাইয়ের মধ্যে একটি বিষয় নিয়ে বিবাদ আছে। তিনি বললেন ঃ আমার উপর তোমার পিতার অনুগ্রহ আছে। আমি এর প্রতিদান তোমাকে দিতে চাই। শুন, বিবাদ করার চেয়ে মন্দ কোন কিছু নেই। এতে ধর্মকর্ম বরবাদ হয়, ভদ্রতা বিনষ্ট হয় এবং জীবনের আনন্দ উধাও হয়ে যায়। অন্তর এতেই জড়িত থাকে। একথা শুনে আমি গৃহে চলে যাওয়ার জন্যে উঠলাম। আমার প্রতিপক্ষ বলল ঃ কোথায় যাও? আমি বললাম ঃ না– আর বিবাদ নয়। সে বলল ঃ বোধ হয় জেনে নিয়েছ যে, আমিই সত্যপথে আছি। বললাম ঃ না, তা নয়, কিন্তু আমি বিবাদ দূরে ঠেলে দিয়ে নিজে মহৎ হতে চাই। সে বলল ঃ যদি তাই হয় তবে আমিও আর কোন দাবী রাখছি না। সে বস্তুটি এখন তুমিই নিয়ে নাও।

এখানে প্রশ্ন হয়, যখন কারও হক কোন জালেম ব্যক্তি আত্মসাৎ করে, তখন তা উদ্ধার করার জন্যে মামলা মোকদ্দমা করা জরুরী হয়। সুতরাং এটা নিন্দনীয় হবে কেন? জওয়াব হচ্ছে, মামলা-মোকদ্দমা সব সময় এক রকমই হয় না। কখনও মিথ্যা হয় এবং কখনও না জেনে না শুনেও হয়; যেমন উকিল সত্য কোন্ পক্ষে তা না জেনেও যুক্তি প্রমাণ পেশ করে। আবার কখনও হকের পরিমাণের চেয়ে বেশী হকের জন্যেও মামলা-মোকদ্দমা করা হয়। মাঝে মাঝে কেবল প্রতিপক্ষকে হেয় ও

নির্যাতিত করার উদ্দেশে মোকদ্দমা করা হয়। এছাড়া শত্রুতার ভিত্তিতে সামান্য বিষয়ের জন্যেও এটা করা হয়। এ ধরনের মামলা-মোকদ্দমা অত্যন্ত নিন্দনীয়। যদি মযলুম ব্যক্তি আপন হক পাওয়ার জন্যে শরীয়ত অনুযায়ী মামলা করে, নীচতা, অপব্যয় ও প্রয়োজনের অধিক হাঙ্গামা না করে এবং শত্রুতা ও নির্যাতনের ইচ্ছা মাঝখানে না থাকে, তবে এরূপ মামলা মোকদ্দমা হারাম নয়, কিন্তু যে পর্যন্ত মোকদ্দমা ছাড়াই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যায় সেই পর্যন্ত নালিশ না করাই উত্তম। কেননা, মামলা মোকদ্দমা ও ঝগড়ার মধ্যে জিহ্বাকে সীমার মধ্যে রাখা খুবই কঠিন। ঝগড়ার কারণে বুকের মধ্যে ক্রোধের শিখা উত্থিত হয়। এর কারণে হক-নাহকের বিবেচনা শিকায় উঠে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে কেবল হিংসা বিদ্বেষই বাকী থেকে যায়। এমনকি, এক পক্ষের দুঃখে অপর পক্ষ আনন্দিত হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে ঝগড়া ও মামলা মোকদ্দমা করে, সে উপরোক্ত অনিষ্টসমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, কমপক্ষে তার মনে উদ্বেগ প্রবল থাকে। এমনকি, কিভাবে প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করা যায়, নামাযের মধ্যেও এই চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে।

কথার প্রাঞ্জলতার জন্যে লৌকিকতা ঃ অধিকাংশ বক্তার অভ্যাস হচ্ছে, তারা মূল বিষয়বস্তু বর্ণনার পূর্বে ভূমিকা সাজায়। এ ধরনের লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা নিন্দনীয়।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ انا واتقياء امتى براء من التكلف

–আমি এবং আমার উম্মতের পরহেযগার ব্যক্তিগণ লৌকিকতা থেকে মুক্ত।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

شرار امتى الذين غدوا بالنعيم ياكلون الوان الطعام ويلبسون الوان الثياب يتشدقون فى الكلام -

–আমার উম্মতের মন্দ লোক তারা, যারা ধন-দৌলতের মধ্যে লালিত পালিত হয়, নানাবিধ খাদ্য ভক্ষণ করে, বৈচিত্র্যময় পোশাক পরিধান করে এবং কথা বলার মধ্যে লৌকিকতা করে।

ওমর ইবনে সা'দ একদিন তাঁর পিতার কাছে কিছু অভাব অনটনের কথা বলতে এসে দীর্ঘ ভূমিকা পেশ করলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বললেন, অভাবের কথা বলতে গিয়ে আজ যে দীর্ঘ ভূমিকা তুমি বর্ণনা

করলে, তা কখনও করনি। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, এমন এক যমানা আসবে যখন মানুষ কথা চিবিয়ে চিবিয়ে বলবে, যেমন গাভী ঘাস চিবায়। এ থেকে জানা গেল, হযরত সা'দ (রাঃ) অভাব ব্যক্ত করার পূর্বে পুত্রের ভূমিকা বর্ণনাকে দূষণীয় মনে করেছেন। তিনি একে নিছক লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা আখ্যা দিয়েছেন। কথার মধ্যে অভ্যাস বহির্ভূত ছন্দের মিলও এর মধ্যে দাখিল। অতএব কথা এমনভাবে বলতে হবে, যাতে উদ্দেশ্য হাসিল হয়। উদ্দেশ্য কেবল অন্যকে বুঝানো । এছাড়া যা কিছু করা হবে, সবই লৌকিকতা। হাঁ, খোতবা ও ওয়াযে উৎকৃষ্ট শব্দের ব্যবহার যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে থাকে। তাই এতে উৎকৃষ্ট ভাষা থাকা ভাল।

অশ্লীল কথন ও গালিগালাজ ঃ এটাও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। আভ্যন্তরীণ নষ্টামি ও বিদ্বেষ থেকেই এর উৎপত্তি। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

اياكم والفحش فان الله لايحب الفحش والتفحيش -

–তোমরা অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাক। আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতা ও সীমাতিরিক্ত অনর্থক বকাবকি পছন্দ করেন না।

বদর যুদ্ধে যেসকল মুশরিক নিহত হয়েছিল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকেও গালি দিতে নিষেধ করে বলেছিলেন ঃ তাদেরকে গালি দিয়ো না। কেননা তোমরা যা বল তাতে তাদের তো কিছুই হয় না, কেবল জীবিতদেরই কষ্ট হয়ে থাকে। আর সাবধান, মন্দ বলা নীচতা।

অশ্লীলতার সংজ্ঞা হচ্ছে, লজ্জাজনক বিষয়সমূহ পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা– যেমন লজ্জাস্থানের নাম মুখে উচ্চারণ করা। অধিকাংশ ভাঁড় দিবারাত্র এরূপ শব্দ উচ্চারণ করে ফিরে, কিন্তু সৎ সাধু ব্যক্তিরা এসব শব্দ মুখে আনতে লজ্জাবোধ করে এবং প্রয়োজনের সময় ইঙ্গিতে উল্লেখ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহু লজ্জাশীল। তিনি গোনাহ মাফ করেন এবং ইশারায় বর্ণনা করেন। দেখ, তিনি সহবাসকে "লমস" তথা স্পর্শ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু এর জন্যে কতক এমন শব্দ মানুষের মধ্যে ব্যবহৃত আছে, যা না বলাই ভাল এবং প্রায়ই গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোর কতক শব্দের মধ্যেও অশ্লীলতা বেশী এবং কতক শব্দের মধ্যে কম। দেশ ও জাতির অভ্যাসভেদে এগুলোর মধ্যেও বিভিন্নতা আছে। কেবল স্ত্রী সঙ্গমের মধ্যেই অশ্লীলতা সীমিত নয়; বরং প্রত্যেক অপছন্দনীয় বিষয়কেও

এরূপ মনে করা উচিত। উদাহরণতঃ মলত্যাগের জন্য পায়খানা ও প্রস্রাব শব্দ ব্যবহার করলে এটা অন্যান্য শব্দের তুলনায় ভাল। মোট কথা, যেসব শব্দ সাধারণভাবে পছন্দীয় নয় সেগুলো পরিষ্কার উল্লেখ করা অনুচিত। করলে অশ্লীলতার মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে নারীদের উল্লেখও ইশারায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। উদাহরণতঃ 'আমার স্ত্রী একথা বলেছে' না বলে 'ঘরে একথা বলা হয়েছে', 'পর্দার আড়াল থেকে বলা হয়েছে', অথবা 'বাচ্চাদের মা একথা বলেছে' বলা উচিত। এমনিভাবে কারও ধবলকুষ্ট, কুষ্ঠ, অর্শ ইত্যাদি ঘৃণা উদ্রেককারী রোগ থাকলে এগুলো উল্লেখ করা ঠিক নয়, বরং 'দুরারোগ্য ব্যাধি' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বর্ণনা করবে। আলা ইবনে হারূন বলেন, খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের একবার বগলে ফোঁড়া বের হয়। তিনি জিহ্বার খুব হেফাযত করতেন। তাই আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম, দেখি, এ ব্যাপারে তিনি কি বলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ ফোঁড়া কোথায় বের হয়েছে? তিনি বললেন ঃ বাহুর ভিতরের দিকে ।

অশ্লীলতার কারণে অপরকে কষ্ট দেয়া হয়ে থাকে অথবা মন্দ লোকের সংসর্গে এই বদভ্যাস গড়ে উঠে। জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল, আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর। তোমার মধ্যে কোন বিষয় দেখে যদি কেউ তোমাকে লজ্জা দেয়, তবে তুমিও তার বিষয় দেখে তাকে লজ্জা দিয়ো না। অর্থাৎ কেউ মন্দ বললে জওয়াবে তুমি তেমনি মন্দ বলো না। এতে সে শাস্তি ভোগ করবে এবং তুমি সওয়াব পাবে। কোন কিছুকে গালি দেবে না। বেদুঈন বলে, এরপর আমি কখনও গালি দেইনি। আয়ায ইবনে হেমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ এক ব্যক্তি আমাকে গালি দেয়। সে মর্তবায় আমার চেয়ে কম। আমিও তার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নিলে ক্ষতি কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ গালিগালাজকারী উভয়ই শয়তান হয়ে থাকে। তারা একে অপরকে মিথ্যাবাদী বলে এবং অপবাদ আরোপ করে।

এক হাদীসে আছে– سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر

–মুমিনকে গালি দেয়া পাপাচার এবং লড়াই করা কুফর।

এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে– সর্ববৃহৎ কবীরা গোনাহ হচ্ছে পিতামাতাকে গালি দেয়া। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ মানুষ পিতামাতাকে কিরূপে গালি দেবে? তিনি বললেন ঃ অন্যের পিতামাতাকে

গালি দেয় এবং জওয়াবে সে তার পিতামাতাকে গালি দেয়। এভাবে আপন পিতামাতাকে গালি দেয়ার কারণ সে নিজেই হয়।

অভিসম্পাত ও ভর্ৎসনা ঃ এটা জন্তু-জানোয়ার, মানুষ ও জড় পদার্থ সকলের জন্যে সমান। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন-

لَاتَلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلَابِغَضَبِهٖ وَلَا بِجَهَنَّمَ

–তোমরা একে অপরকে আল্লাহর লানত, আল্লাহর গযব বা জাহান্নাম দ্বারা অভিসম্পাত করো না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন- একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকরকে তার এক গোলামের প্রতি অভিসম্পাত করতে শুনলেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন ঃ হে আবু বকর, সিদ্দীকও অভিসম্পাত করে? কাবার পালনকর্তার কসম! এ বাক্যটি তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) সেদিনই গোলামটিকে মুক্ত করে দিলেন এবং রসূলুল্লাহ (রাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করলেন ঃ এখন থেকে আমি কখনও এরূপ ভুল করব না।

এক হাদীসে বলা হয়েছে–

اِنَّ اللَّاعِنِيْنَ لَايَكُوْنُوْنَ شُفَعَاءَ وَلَاشُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

–অভিসম্পাতকারীরা কেয়ামতের দিন সুপারিশকারীও হবে না, সাক্ষ্যদাতাও হবে না।'

লানত তথা অভিসম্পাতের অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। সুতরাং এ শব্দটি তার ক্ষেত্রেই বলা দুরস্ত হবে, যার মধ্যে রহমত থেকে দূরে সরে যাওয়ার বিশেষণ পাওয়া যায়। এরূপ বিশেষণ হচ্ছে কুফর ও জুলুম। অতএব কাফের উপর অথবা জালেমের উপর অভিসম্পাত হোক, একথা বলা জায়েয। মোট কথা, শরীয়তে যেমন বর্ণিত আছে, সেসব শব্দ দ্বারা অভিসম্পাত করা উচিত। কেননা, এতে বিপদও আছে। কারণ এটা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী যে, তার অভিশপ্তকে আল্লাহ তাআলা রহমত থেকে দূর করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানতে পারে না অথবা আল্লাহ আপন রসূলকে বলে দিলে তিনি জানতে পারেন।

জানা উচিত, তিনটি বিশেষণ লানতের দাবী রাখে– কুফর, বেদআত ও পাপাচার। এসব বিশেষণে লানত করার পন্থা তিনটি। প্রথম, ব্যাপক বিশেষণ সহকারে লানত করা; যেমন 'কাফের, বেদআতী ও ফাসেকদের

উপর আল্লাহর লানত হোক' বলা; অথবা 'ইহুদী, খৃষ্টান, যিনাকার, জালেম ও সুদখোরের উপর লানত হোক বলা। এই উভয়বিধ পন্থায় লানত করা জায়েয। তবে বেদআতীদের উপর লানত করতে সর্বসাধারণকে নিষেধ করা উচিত। কেননা, কোন্‌টি বেদআত, তা চেনা কঠিন। হাদীসে এর জন্যে কোন শব্দ বর্ণিত নেই। তৃতীয় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লানত করা। উদাহরণতঃ যায়দ কাফের, ফাসেক অথবা বেদআতী হলেও যায়দের উপর অভিসম্পাত হোক বলা যাবে না, কিন্তু শরীয়তে যার উপর লানত প্রমাণিত আছে, তার উপর লানত হোক বলায় দোষ নেই; যেমন 'ফেরাউন ও আবু জাহলের উপর লানত হোক' বলা, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট জীবিত ব্যক্তি কট্টর কাফের হলেও তার উপর লানত করা ঠিক নয়; সম্ভবতঃ সে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতঃ মুমিন হয়ে যাবে।

ইয়াযীদ হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল অথবা হত্যার অনুমতি দিয়েছিল। তাকে লানত বলা জায়েয কিনা? এ প্রশ্নের জওয়াব হচ্ছে, হত্যা ও হত্যার অনুমতি উভয়টি যথার্থ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। হত্যা ও হত্যার অনুমতি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে ঘাতক বলা যায় না। কেননা, হত্যা কবীরা গোনাহ্। কোন মুসলমানকে বিনা প্রমাণে হত্যাকারী বলা যায় না। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যদি কেউ কাউকে কাফের অথবা ফাসেক বলে, বাস্তবে সে এরূপ না হলে যে বলে তার প্রতিই ফিরে আসে। যদি কেউ বলে, "ইমাম হোসাইনের হত্যাকারীর উপর লানত হোক"– তবে এটা জায়েয কিনা? জওয়াব হল– এর সাথে একথাও বলা উত্তম, যদি সে তওবা না করে মরে থাকে, তবে তার উপর লানত হোক। কেননা, তওবার পর মৃত্যুবরণ করারও সম্ভাবনা আছে। দেখ, ওয়াহশী (রাঃ) রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) পিতৃব্য হযরত হামযা (রাঃ)-কে কাফের অবস্থায় শহীদ করেছিলেন। এরপর মুসলমান হয়ে কুফর ও হত্যা সবকিছু থেকে তওবা করেছিলেন। এখন কেউ তার উপর লানত করতে পারবে না। এখানে ইয়াযীদকে লানত করার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার কারণ, আজকাল মানুষ লানত করার ব্যাপারে তড়িঘড়ি মুখ খোলে। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে– মুমিন লানতকারী হয় না। সুতরাং যে কাফের অবস্থায় মারা যায়, তাকে ছাড়া কাউকে লানত করা ঠিক নয়। যদি একান্তই মনে চায়, তবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখ না করে ব্যাপক বিশেষণ সহকারে লানত করবে। লানত করার চেয়ে আল্লাহ্‌র যিকির করা উত্তম। এটা না হলে চুপ থাকার মধ্যেই নিরাপত্তা।

গান ও কবিতা আবৃত্তি ঃ গানের মধ্যে কোন্‌টি হারাম ও কোন্‌টি

হালাল সেমা অধ্যায়ে আমরা তা লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কবিতা ভালও আছে মন্দও আছে, অবশ্য একেবারে কবিতার মধ্যেই ডুবে যাওয়া নিন্দনীয়। অযথা কথাবার্তা না হলে কবিতা আবৃত্তি করা ও রচনা করা হারাম নয়, কিন্তু কথা হচ্ছে, কবিতার মধ্যে প্রায়ই প্রশংসা, দুর্নাম রটনা ও নারীদের উল্লেখ থাকে। এতে মিথ্যারও অবকাশ আছে। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ) হযরত হাসসান ইবনে সাবেত আনসারী (রাঃ)-কে কবিতায় কাফেরদের দুর্নাম বর্ণনা করার আদেশ করেছিলেন। কারও প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করলে যদিও কিছুটা মিথ্যা হয়, কিন্তু হারাম হয় না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনেও এমন কবিতা পাঠ করা হয়েছে, যাতে তালাশ করলে বাড়াবাড়ির বিষয়বস্তু পাওয়া যাবে, কিন্তু তিনি কখনও নিষেধ করেননি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন আমি সূতা কাটছিলাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জুতা সেলাই করছিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর কপাল ঘর্মাক্ত এবং ঘর্মবিন্দু আলোর মধ্যে নক্ষত্রপুঞ্জের অপরূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন করছে। আমি দেখামাত্রই এই অলৌকিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়লাম। তিনি আমার হতবুদ্ধিতা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ এমন বিস্ময়াবিষ্ট হচ্ছ কেন? আমি আরজ করলাম ঃ আপনার ললাটের ঘর্মবিন্দু থেকে সৌন্দর্যের যে তরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে, তাতেই আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছি। যদি আবু বকর হুযলী আপনাকে এই মুহূর্তে দেখতে পেত, তবে অবশ্যই জেনে নিত, তার কবিতার মূর্ত প্রতীক আপনিই। তিনি বললেন ঃ তার কবিতা কি ? আমি আরজ করলাম ঃ এ দু'টি পংক্তি –

ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل

واذا نظرت الى اسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل

–সে মুক্ত ঋতুস্রাবের মলিনতা থেকে, দুধমাতার ভ্রষ্টতা থেকে এবং শয়তানের ব্যায়াম থেকে। তুমি যখন তার মুখমণ্ডলের পানে তাকাবে, তখন মনে হবে যেন তা বিদ্যুৎ উজ্জ্বল মেঘমালার ন্যায় ঝলমল করছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর রসূলূল্লাহ্ (সাঃ) আপন কাজ ছেড়ে আমার ললাটে চুম্বন এঁকে দিলেন। তিনি বললেন ঃ

جزاك الله خيرا يا عائشة –আয়েশা, আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তুমি আমার প্রতি সম্ভবতঃ এতটুকু খুশী হওনি, যতটুকু আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।

হোনায়ন যুদ্ধের পর রসূলে আকরাম (সাঃ) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করলেন এবং আব্বাস ইবনে মেরদাসকে চারটি উট দান করলেন। সে উট নিয়ে চলে গেল এবং তার হক আরও বেশী বলে অভিযোগ করে একটি কবিতা রচনা করল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করলেন ঃ তার অভিযোগ মিটিয়ে দাও। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং এত বেশী দিলেন যে, সে ওযর পেশ করতে শুরু করল এবং বলল ঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। কবিতা যখন আমার জিহ্বায় পিঁপড়ার মত দংশন করতে থাকে, তখন কিছু না বলে উপায় থাকে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাসলেন এবং বললেন ঃ যতদিন উট উচ্চ কণ্ঠে চেঁচাবে, ততদিন আরবরা কবিতা বলা ত্যাগ করবে না।

হাসিঠাট্টা ঃ আসলে এটাও খারাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু অল্প হলে দোষ নেই। হাদীসে আছে ঃ لاتمار اخاك ولاتمارخه –আপন ভাইয়ের কথার মধ্যে কথা বলো না এবং তার সাথে ঠাট্টা করো না। কথার মধ্যে কথা বললে অপরের মনে কষ্ট হয়; তাকে মিথ্যুক ও মূর্খ সাব্যস্ত করা হয়। হাসিঠাট্টার মধ্যে এটা নেই। তবুও হাসিঠাট্টা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে বাড়াবাড়ির করা। এতে মন সর্বক্ষণ খেলাধুলা ও কৌতুকে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। খেলাধুলা যদিও মোবাহ, কিন্তু সর্বক্ষণ এতে লিপ্ত থাকা নিষিদ্ধ। অধিক হাসির কারণে অট্টহাসির পথ খুলে যায়, যদ্দরুন অন্তর মরে যায় এবং অন্তরে শক্রুতা সৃষ্টি হয়। ভাবমুর্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। হাসি এসব দোষ থেকে মুক্ত হলে নিন্দনীয় নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন– انى لامازج ولا اقول الاحقا – আমি হাসিঠাট্টা করি, কিন্তু সত্য ছাড়া মিথ্যা বলি না। এটা তাঁরই বৈশিষ্ট্য। অন্যদের উদ্দেশ্য তো হয়ে থাকে যেভাবেই হোক কেবল অপরকে হাসানো। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যে বেশী হাসে, তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব হ্রাস পায়। যে আনন্দ গীত গায়, সে মানুষের দৃষ্টিতে পাতলা হয়ে যায়। যে এ কাজ বেশী করে, সে এ নামেই খ্যাত হয়ে যায়। যে বেশী কথা বলে, সে বেশী ভুল করে। যে বেশী ভুল করে তার লজ্জা কমে যায়। যার লজ্জা কম, তার পরহেযগারীও কম। যার পরহেযগারী কম, তার অন্তর মরে যায়। আর একটি কারণ হচ্ছে, হাসির কারণে মানুষ আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে যায়।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا –যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি, তবে

ক্রন্দন করতে বেশী এবং হাসতে কম। ওহায়ব ইবনে ওয়ারদ কিছু লোককে ঈদুল ফিতরের দিন হাসাহাসি করতে দেখে বললেন ঃ যদি এদের মাগফেরাত হয়ে থাকে, তবে এটা শোকরকারীদের কাজ নয়। আর মাগফেরাত না হয়ে থাকলে এটা ভীতদেরও কাজ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি গোনাহ করে হাসে, সে কাঁদতে কাঁদতে দোযখে যাবে।

যে হাসি সরবে হয় তাই খারাপ। অর্থাৎ যা মুচকি হাসির চেয়ে বেশী তা নিষিদ্ধ। নীরব হাসি, যাকে আরবীতে 'তাবাস্সুম' বলা হয়, তা ভাল। রসূলে করীম (সাঃ)ও মুচকি হাসতেন।

এক্ষণে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাসি ঠাট্টা কিরূপ ছিল, তার কয়েকটি নমুনা পেশ করা হচ্ছে। হযরত হাসান (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন, এক বৃদ্ধা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি তাকে বললেন ঃ কোন বৃদ্ধ জান্নাতে যাবে না। এ কথা শুনে বৃদ্ধা কান্না জুড়ে দিল। তিনি বললেন, আরে, কাঁদ কেন? তুমি যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধ থাকবে না, ষোড়শী হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ إِنَّا أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا –আমি তাদেরকে আবার সৃষ্টি করব এবং কুমারী যুবতীতে পরিণত করব। যায়দ ইবনে আসলাম রেওয়ায়াত করেন, উম্মে আয়মন নাম্নী জনৈকা মহিলা রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করল ঃ আমার স্বামী আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছে। তিনি বললেন ঃ তোমার স্বামী কি সেই ব্যক্তি নয়, যার চোখে শুভ্রতা আছে? মহিলা বলল, তার চোখ তো ভাল। তাতে শুভ্রতা নেই। তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আছে। মহিলা কসম খেয়ে বলল ঃ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার চোখে শুভ্রতা নেই। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের চক্ষু কোটর সাদা ও কাঁল হয়ে থাকে। অন্য একজন মহিলা তাঁর খেদমতে এসে সওয়ারীর জন্যে একটি উট প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে সওয়ারীর জন্যে একটি উটের বাচ্চা দেব। মহিলা বলল ঃ বাচ্চা নিয়ে আমি কি করব? তিনি বললেন ঃ উট তো উটের বাচ্চাই হয়ে থাকে। যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবী যারপরনাই কুশ্রী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন বয়াত করার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন পর্যন্ত পর্দার বিধান ছিল না। বয়াতের পর যাহ্হাক আরজ করলেন ঃ আমার দু'জন স্ত্রী আছে, যারা এই গোরা মহিলা অর্থাৎ হযরত আয়েশা

(রাঃ)-এর চেয়েও ভাল। আপনি বিবাহ করলে তাদের একজনকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারা সুশ্রী, না তুমি সুশ্রী? সে বলল ঃ আমি তাদের চেয়ে অনেক ভাল। এই সওয়াল জওয়াব শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই ভেবে হাসি সংবরণ করতে পারলেন না যে, এমন সুরত নিয়েও সে নিজেকে সুশ্রী মনে করে নায়ীমান আনসারী একজন হাস্যকারী ব্যক্তি ছিল, কিন্তু খুব মদ্যপান করত। মদ্যপানের পর তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত করা হলে তিনি আপন জুতা দিয়ে তাকে খুব প্রহার করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও আদেশ করতেন, তাঁরাও জুতা মারতেন। অনেকবার এরূপ প্রহৃত হওয়ার পর একদিন জনৈক সাহাবী বললেন ঃ তোমার প্রতি আল্লাহর লানত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীকে বললেন ঃ এরূপ বলো না। এ ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি মহব্বত রাখে। এই নায়ীমানের অবস্থা ছিল, মদীনায় কখনও দুধ অথবা অন্য কোন খাদ্যবস্তু এলে সে তা ক্রয় করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত করত এবং বলত, হুযুর, এ বস্তুটি আমি আপনার জন্যেই ক্রয় করেছি এবং হাদিয়া এনেছি। যখন সেই বস্তুর মালিক দাম চাইতে আসত, তখন তাকেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত করে বলত, হুযুর অমুক বস্তুর দামটি দিয়ে দিন। তিনি বলতেন ঃ তুমি তো আমাকে হাদিয়া দিয়েছিলে। সে আরজ করত, আমার কাছে দাম ছিল না, কিন্তু মন চাচ্ছিল, আপনি এ বস্তুটি খান। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেসে দাম দিয়ে দিতেন। অতএব এ ধরনের হাসিঠাট্টা কখনও কখনও করা জায়েয।

উপহাস ও কৌতুক ঃ যদি এর দ্বারা অপরের কষ্ট হয়, তবে হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ -

মুমিনগণ! তোমাদের একদল অপর দলের সাথে যেন উপহাস না করে। সম্ভবতঃ তারা তাদের চেয়ে উত্তম হবে। মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের সাথে উপহাস না করে। সম্ভবতঃ তারা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।

উপহাসের অর্থ হচ্ছে অপরের হেয়তা প্রকাশ করা এবং তার দোষত্রুটি হাস্যকর পন্থায় বর্ণনা করা। এটা তার কথা ও কাজের অনুকরণ অথবা ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা হতে পারে। অনুপস্থিতিতে হলে এটা গীবত

এবং উপস্থিতিতে হলে উপহাস, কিন্তু উভয়ের সারমর্ম এক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি এক ব্যক্তির অনুকরণ করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

وَاللّٰهِ مَا اُحِبُّ اَنِّىْ حَاكَيْتُ اِنْسَانًا وَلِىْ كَذَا وَكَذَا

–আল্লাহর কসম. অনেক কিছু পাওয়ার বিনিময়েও আমি পছন্দ করি না যে, কোন মানুষের অনুকরণ করি।

যদি কোন ব্যক্তি উপহাসে খুশী হয়, তবে একে উপহাস না বলে ঠাট্টা বলা হবে, যার বিধান পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ঃ

গোপন কথা ফাঁস করা ঃ এটাও নিষিদ্ধ। কারণ এতেও কষ্ট হয় এবং বন্ধুত্বের হক বিনষ্ট হয়।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِىَ اَمَانَةٌ

–যখন কোন ব্যক্তি কথা বলার পর আড় চোখে তাকায় তখন এটা আমানত হয়ে যায়।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন ঃ কোন ভাইয়ের গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেয়াও খেয়ানতের মধ্যে দাখিল।

বর্ণিত আছে, আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) ওলীদ ইবনে ওতবাকে কোন গোপন তথ্য বললেন। তিনি আপন পিতা ওতবাকে গিয়ে বললেন ঃ আজ আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) একটি গোপন কথা বলেছেন। আমাকে যখন বলেছেন, তখন আপনার কাছে আর গোপন থাকবে কেন? ওতবা বললেন, ব্যাপারটি আমাকে বলো না। কারণ, যতক্ষণ মানুষ গোপন তথ্য গোপন রাখে, ততক্ষণ তার থাকে, কিন্তু বলে দিলে অপরের এখতিয়ারে চলে যায়। ওলীদ বললেন ঃ পিতা পুত্রের মধ্যেও এরূপ হয় নাকি? তিনি বললেন ঃ পিতা পুত্রের মধ্যে হয় না ঠিক, কিন্তু আমি চাই, গোপন তথ্য ফাঁস করার অভ্যাস যেন তোমার না হয়। এরপর ওলীদ আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর খেদমতে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা তোমাকে ভুলের গোলামী থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। সারকথা, গোপন তথ্য ফাঁস করা খেয়ানত। এতে কারও ক্ষতি হলে হারাম। ক্ষতি না হলেও নীচতা।

মিথ্যা ওয়াদা ঃ ওয়াদা করার ক্ষেত্রে জিহ্বা অগ্রে থাকে, কিন্তু তা পূর্ণ করা মনের জন্যে অপ্রিয় হয়ে থাকে। ফলে ওয়াদা মিথ্যা কথায়

পর্যবসিত হয়। এটা মোনাফেকীর আলামত।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

–মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ ওয়াদা করা দানের মধ্যে গণ্য। তিনি আরও বলেন ঃ ওয়াদাও এক প্রকার কর্জ। আল্লাহ্ পাক নবী হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর প্রশংসায় বলেন ঃ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ –সে ছিল ওয়াদায় সাচ্চা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি বললেন ঃ জনৈক কোরায়শী ব্যক্তি আমার কাছে আমার কন্যা বিবাহ চেয়েছিল। আমি কিছুটা দোদুল্যমান ওয়াদা করেছিলাম। আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁর কাছে এক তৃতীয়াংশ মোনাফেকী নিয়ে যাব না। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি সে ব্যক্তিকেই কন্যা দান করলাম। আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হাসান রেওয়ায়াত করেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে নবুওয়তের পূর্বে একটি লেনদেন করেছিলাম। তাঁর কিছু প্রাপ্য আমার কাছে বাকী ছিল। আমি আরজ করলাম ঃ এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, কিন্তু আমি সেদিন এবং পরের দিন সম্পূর্ণ ভুলে রইলাম। তৃতীয় দিন এসে তাঁকে সেই জায়গাতেই পেলাম। তিনি বললেন ঃ মিয়া, তুমি বড় বিপদে ফেলে দিলে। এখানে তিন দিন ধরে তোমার অপেক্ষা করছি।

ইবরাহীম ইবনে আদহামকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ যদি কেউ আসার ওয়াদা করে যায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে না আসে, তবে তার জন্যে কতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? তিনি বললেন, পরবর্তী নামাযের সময় আসা পর্যন্ত। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) প্রত্যেক ওয়াদার সাথে "ইনশাআল্লাহ্" বলতেন। এতে ওয়াদা পূর্ণ করা না হলেও কোন দোষ থাকে না। এর সাথে পাকাপোক্ত ইচ্ছা থাকলে তা পূর্ণ করা উচিত। যদি কেউ ওয়াদা করার সময়ই পাকা ইচ্ছা রাখে যে, পূর্ণ করবে না, তবে এরই নাম 'নেফাক'। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি অভ্যাস পাওয়া যাবে, সে পাকা মোনাফেক, যদিও সে নামায রোযা আদায় করে এবং মুসলমান বলে দাবী করতে থাকে। অভ্যাস তিনটি এই ঃ (১) কথা বললে মিথ্যা বলা (২) ওয়াদা করলে তা পূর্ণ না করা এবং (৩) আমানত রাখা হলে তাতে খেয়ানত করা। এটা তারই অবস্থা, যে ওয়াদা করার সময় পূর্ণ করার নিয়ত রাখে না, অথবা ওযর ছাড়াই ওয়াদার খেলাফ করে, কিন্তু যে ওয়াদা করার সময় পূর্ণ করার ইচ্ছা রাখে, অতঃপর কোন ওযরের

কারণে পূর্ণ না করে, সে মোনাফেক হবে না। রসূলে করীম (সাঃ) আবুল হায়সামকে একটি গোলাম দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। এরপর গনীমতের মালে তিনটি গোলাম আসে। দুটি গোলাম বন্টন করে দেয়া হল। একটি রয়ে গেল। আদরের দুহিতা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এসে বললেন ঃ দেখুন, যাঁতাকল চালাতে চালাতে আমার হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে। এ গোলামটি আমাকে দান করুন, কিন্তু আবুল হায়সামের সাথে কৃত ওয়াদা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মনে পড়ে গেল। তিনি কন্যাকে বললেন ঃ তোমাকে গোলাম দিয়ে দিলে আমার ওয়াদা বিপন্ন হবে। এরপর তিনি গোলামটি আবুল হায়সামকেই দান করেন।

মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া ঃ এটা জঘন্য অপরাধ ও মহাপাপ। ইসমাঈল ইবনে ওয়াসেতা বলেন ঃ রসূলল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে খোতবায় এ কথা বলতে শুনলাম– আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, হিজরতের প্রথম বছরে রসূলে আকরাম (সাঃ) এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন -এতটুকু বলেই হযরত আবু বকর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। এরপর কান্না থামিয়ে এই হাদীস বর্ণনা করলেন–

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ.

–তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপাচারের সঙ্গী, তাদের উভয়ের স্থান জাহান্নাম। তোমরা সততা আঁকড়ে থাক। সততা পুণ্য কাজের সঙ্গী। তারা উভয়েই জান্নাতে স্থান পাবে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ব্যবসায়ীরা পাপাচারী হয়ে থাকে। সাহারায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ হুযুর, আল্লাহ্ তাআলা ক্রয়-বিক্রয় হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতএব ব্যবসায়ীদের পাপাচারী হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ কারণ, তারা কসম খেয়ে খেয়ে গোহাহগার হয় এবং কিছু বললে মিথ্যা বলে। তিনি আরও বলেন ঃ তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেবেন না। প্রথম, যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়, যে মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে পণ্য বিক্রি করে। তৃতীয়, যে গিঁটের নীচে পর্যন্ত পায়জামা পরিধান করে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের কাছে মিথ্যার চেয়ে অধিক কোন বদভ্যাস অপ্রিয় ছিল না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন

সাহাবীর মিথ্যা জেনে নিতেন, তখন সে ব্যক্তির নতুনভাবে আল্লাহ্র সামনে তওবা না করা পর্যন্ত তিনি তার প্রতি মন থেকে মলিনতা দূর করতে পারতেন না। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আরজ করলেন ঃ তোমার বান্দাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে ভাল? এরশাদ হল ঃ যার জিহ্বা মিথ্যা বলে না, অন্তর পাপাচারে লিপ্ত হয় না এবং লজ্জাস্থান যিনা করে না। হযরত লোকমান আপন পুত্রকে বললেন ঃ মিথ্যা বলো না, যদিও তা পাখীর মাংসের মত সুস্বাদু মনে হয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম মনে হয় যার নাম উত্তম। যখন সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তখন সে ব্যক্তি ভাল মনে হয়, যার অভ্যাস ভাল। লেনদেন করার পর সে ব্যক্তি ভাল মনে হয়, যে কথায় সাচ্চা এবং ওয়াদায় পাক্কা। খালেদ ইবনে সবীহ্কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ একবার মিথ্যা বললেও কি কাউকে মিথ্যাবাদী বলা হবে? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই।

যে যে স্থানে মিথ্যা বলা জায়েয ঃ প্রকাশ থাকে যে, মিথ্যা সত্তাগতভাবে হারাম নয়; বরং এদিক দিয়ে হারাম যে, এর দ্বারা অন্যের ক্ষতি সাধিত হয়। এ ক্ষতির সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে আসল সত্য সম্পর্কে মূর্খ থাকা। সুতরাং যদি কোথাও আসল সত্য সম্পর্কে মূর্খ থাকার মধ্যে উপকারিতা থাকে, তবে মিথ্যা বলার অনুমতি হওয়া উচিত; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজিব হওয়া দরকার। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন ঃ মিথ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি পলায়ন করে তোমার মাধ্যমে এক গৃহে আত্মগোপন করে এবং অন্য এক ব্যক্তি তরবারি নিয়ে তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্যে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে, সে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, অমুক ব্যক্তি কোথায়? তবে এ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজিব।

সারকথা, যেখানে একটি উৎকৃষ্ট লক্ষ্য মিথ্যা ও সত্য উভয়টি দ্বারা অর্জিত হতে পারে, সেখানে মিথ্যা বলা হারাম। আর যদি কেবল মিথ্যা দ্বারাই সেই লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে, তবে লক্ষ্য বৈধ হলে মিথ্যা বলাও বৈধ এবং লক্ষ্য ওয়াজিব হলে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব; যেমন বর্ণিত উদাহরণ দ্বারা বুঝা যায়। যেখানে পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন মিথ্যা ছাড়া সম্ভবপর হয় না, সেখানে মিথ্যা বলা বৈধ; কিন্তু যথাসম্ভব বৈধ মিথ্যা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। কেননা, মিথ্যার অভ্যাস হয়ে গেলে অনাবশ্যক মিথ্যাও মুখে উচ্চারিত হওয়ার অথবা প্রয়োজনের বেশী মিথ্যা বলে ফেলার আশংকা থাকে। এ থেকে জানা গেল, মিথ্যা আসলে হারাম.

কিন্তু প্রয়োজনে জায়েয হতে পারে। হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি কখনও শুনিনি যে, রসূলে করীম (সাঃ) তিনটি জায়গা ছাড়া কোথাও মিথ্যার অনুমতি দিয়েছেন। (১) দু'ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপনে, (২) যুদ্ধক্ষেত্রে এবং (৩) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য দূর করার ক্ষেত্রে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন–

لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ اَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا اَوْ نَمّٰى خَيْرًا

–যে দু'ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপনে ভাল কথা বলে এবং ভাল বর্ণনা করে, সে মিথ্যাবাদী নয়।

হযরত আবু কাহেল বর্ণনা করেন ঃ দু'জন সাহাবীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। অবশেষে তারা খুন খারাবী করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। আমার সাথে তাদের একজনের দেখা হলে আমি তাকে বললাম ঃ তুমি অমুক ব্যক্তির সাথে লড়তে চাও কেন? সে-তো তোমার প্রশংসা করছিল। এরপর অপরজনের সাথেও সাক্ষাৎ করে এ কথাই বললাম। অবশেষে তাদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল। এরপর আমি ভাবতে লাগলাম, তাদের মধ্যে সন্ধি তো হয়ে গেছে, কিন্তু মিথ্যা বলার কারণে আমার কি দশা হবে? তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ হে আবু কাহেল! পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা দরকার, যদিও মিথ্যা বলেই হয়। আতা ইবনে ইয়াসার বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলে করীম (রাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করল ঃ আমার স্ত্রীর সাথে মিথ্যা বলব? তিনি বললেন ঃ মিথ্যার মধ্যে কল্যাণ নেই। সে আরজ করল ঃ আমি তার সাথে ওয়াদা করব? তিনি বললেন ঃ এতে দোষ নেই।

মিথ্যা বলার ব্যাপারে উপরোক্ত তিনটি স্থানের ব্যতিক্রম হাদীস দ্বারা জানা গেল। যদি আরও কোন স্থান এমন হয়, যেখানে বিশুদ্ধ লক্ষ্য সামনে রেখে মিথ্যা বলা হয়, তবে সেই স্থানও এতে দাখিল হবে। উদাহরণ ঃ কোন ডাকাত ও জালেম যদি কাউকে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করে ঃ বল, তোর ধনসম্পদ কোথায়? তবে ধন-সম্পদ নেই বলা তার জন্যে জায়েয।

ইঙ্গিতেও মিথ্যা বলা ঠিক নয় ঃ পূর্ববর্তীদের উক্তি হচ্ছে, ইঙ্গিতে মিথ্যা বললে তা মিথ্যা হয় না। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যদি কেউ ইঙ্গিতে কিছু মিথ্যা বলে তবে সে মিথ্যা থেকে বেঁচে যায়, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য, যখন কেউ মিথ্যা কথা বলার জন্যে বাধ্য হয়, তখন যেন ইঙ্গিতে বলে দেয়। নতুবা বিনা বাধ্যবাধকতায় মিথ্যা বলা প্রকাশ্যেও জায়েয নয়–

ইঙ্গিতেও নয়। ইঙ্গিতে মিথ্যা বলা হচ্ছে এমন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বলা, যার এক অর্থ বক্তার উদ্দেশ্য হয় এবং অন্য অর্থ শ্রোতা বুঝে। উদাহরণতঃ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এক জায়গার গভর্নর ছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এলে তাঁর পত্নী তাঁকে বলল ঃ অন্য গভর্নররা যেমন গৃহে এলে কিছু নিয়ে আসে, তুমিও কিছু এনেছ কি না? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ না। কারণ আমার সাথে একজন গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল। এ কথা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তাআলা, কিন্তু তাঁর পত্নী বুঝলেন, সম্ভবতঃ হযরত ওমর তাঁর পেছনে কোন গুপ্তচর প্রেরণ করেছিলেন। তাই বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ্! তুমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে বিশ্বস্ত ছিলে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর কাছে বিশ্বস্ত ছিলে। আর হযরত ওমর (রাঃ) কি না তোমার পেছনে গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন। মহিলাদের মধ্যে এ বিষয়টির খুব চর্চা হল। অবশেষে হযরত ওমরের কাছেও অভিযোগ পৌঁছল। তিনি হযরত মুয়াযকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কবে তোমার পেছনে গুপ্তচর প্রেরণ করেছিলাম? তিনি বললেন ঃ আমি একথা তো বলিনি যে, আপনি গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন। আমি কেবল বলেছিলাম, আমার সাথে গুপ্তচর ছিল। পত্নীর আবদারের সামনে এছাড়া আমার কোন ওযর ছিল না। হযরত ওমর (রাঃ) হাসলেন এবং তাকে কিছু অর্থকড়ি দিয়ে বললেন ঃ নাও, এ দিয়ে পত্নীকে খুশী কর গে।

মোটকথা, প্রয়োজনের সময় ইঙ্গিতে মিথ্যা বলা যায়। বিনা প্রয়োজনে এটা করা উচিত নয়। কেননা, এটা একটা কৌশল। এতে প্রতিপক্ষ বাস্তবের বিপরীত বুঝে। সুতরাং মাকরূহ। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওতবা বলেন ঃ আমি আমার পিতার সাথে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের খেদমতে গেলাম। তখন আমার পরনে ছিল উৎকৃষ্ট দামী পোশাক। যখন সেখান থেকে বের হলাম তখন আমার উৎকৃষ্ট পোশাক দেখে লোকেরা বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন তোমাকে এই পোশাক দিয়েছেন? আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। এতে আমার পিতা আমাকে শাসিয়ে বললেন ঃ খবরদার, মিথ্যা কথা বলো না। আবদুল্লাহর এ বাক্যটি মিথ্যা ছিল না, কিন্তু সাধারণত শাসনকর্তার জন্যে ওয়াদা কোন পুরস্কারের বিনিময়ে হয়ে থাকে বিধায় লোকেরা এ থেকে এটাই বুঝে থাকবে যে, খলীফা দান করেছেন। এতে যেন একটি মিথ্যা ভিত্তিহীন কথার উপর তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাই তিনি এ দোয়া করতে নিষেধ করলেন।

আর একটি মিথ্যা আছে, যদ্দারা কেউ ফাসেক হয় না। তা হচ্ছে, অভ্যাসগতভাবে অতিরঞ্জিত বলা; যেমন কেউ বলে, তোমাকে এটা করতে একশ' বার নিষেধ করেছি। এতে সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য হয় না; বরং অতিরঞ্জন সহকারে আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য, কিন্তু যে জিহ্বা অতিরিত কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সে মিথ্যার আশংকা থেকে মুক্ত হয় না।

আর একটি মিথ্যার অভ্যাস মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা হচ্ছে, যখন কাউকে বলা হয়– এস, খানা খাও। তখন সে জওয়াব দেয়, আমার ক্ষুধা নেই। কোন বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য এর সাথে জড়িত না থাকলে এটাও মিথ্যা ও হারাম। আসমা বিনতে ওমায়েস বর্ণনা করেন ঃ হযরত আয়েশার (রাঃ) বাসর রাত্রিতে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম এবং আমিই তাকে সাজিয়ে ছিলাম। আমার সাথে আরও কয়েকজন মহিলা ছিল। আমরা যখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে হুযুরের কাছে নিয়ে গেলাম তখন তার গৃহে এক পেয়ালা দুধ ছাড়া কিছুই ছিল না। তা থেকে কিছু তিনি নিজে পান করলেন এবং বাকীটুকু হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে দিলেন। লজ্জায় তিনি হাত বাড়ালেন না। আমি বললাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাত সরিয়ে দিয়ো না, নিয়ে নাও। তিনি লজ্জাভরেই তা নিলেন এবং পান করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার সঙ্গিনীদেরকে দিয়ে দাও। মহিলারা আরজ করল ঃ আমাদের ক্ষুধা নেই। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ পেটে ক্ষুধা ও মিথ্যা একত্র করো না। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি কোন বস্তু আমাদের মনে চায় এবং আমরা বলে দেই, ক্ষুধা নেই, তবে এটাও কি মিথ্যার মধ্যে দাখিল? তিনি বললেন ঃ মিথ্যা মিথ্যাই লেখা হয়। অল্প হলে অল্পই লেখা হয়।

গীবত

গীবতের নিন্দা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে উল্লেখ করেছেন, যারা গীবত করে তারা যেন মৃতের গোশত ভক্ষণ করে। বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ـ

–তোমাদের কেউ যেন কারও গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তা অপছন্দ কর।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ .

–মুসলমানের রক্ত, ধনসম্পদ ও ইযযত সবটুকুই মুসলমানের উপর হারাম।

ইযযত কথাটির মধ্যে গীবতও এসে গেছে। ধনসম্পদ ও রক্তের সাথে একেও একত্রিত করা হয়েছে। হযরত জাবের ও আবু সায়ীদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরশাদ করেন ঃ

إِيَّاكُمْ وَالْغِيبَةَ فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

–তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাক। কেননা, গীবত যিনার চেয়েও জঘন্যতম।

এর কারণ, যিনা করে মানুষ তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করে নেন, কিন্তু গীবতকারীকে ক্ষমা করা হয় না, যতক্ষণ যার গীবত করা হয় সে ক্ষমা না করে। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মেরাজ রজনীতে আমি এমন লোকদের কাছেও গমন করেছি, যারা আপন মুখমণ্ডল নখ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা মানুষের গীবত করত এবং তাদের ইযযত নিয়ে কথাবার্তা বলত। হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলা এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেন– যে ব্যক্তি গীবত থেকে তওবা করে মরবে, সে সকলের পেছনে জান্নাতে যাবে। আর যে তওবা না করে মরবে, সে সকলের অগ্রে দোযখে যাবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ একদিন নবী করীম (সাঃ) রোযা রাখার আদেশ দিয়ে বললেন ঃ যে পর্যন্ত আমি অনুমতি না দেই কেউ ইফতার করবে না। সাহাবায়ে কেরাম রোযা রাখলেন। যখন সন্ধ্যা হল তখন এক একজন এসে ইফতারের অনুমতি নিতে লাগল। এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! দু'জন মহিলাও রোযা রেখেছিল। আপনি অনুমতি দিলে তারাও ইফতার করত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় আরয করল। তিনি এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয় বার আরজ করার পর তিনি বললেন ঃ তারা রোযা রাখেনি। যারা সারাদিন মানুষের মাংস ভক্ষণ করে, তাদের আবার রোযা কিসের? তুমি যেয়ে তাদেরকে বল ঃ তোমরা রোযা রেখে থাকলে বমি কর, সে মহিলাদ্বয়কে এ নির্দেশ শুনিয়ে দিল। তারা বমি করলে প্রত্যেকের মুখ দিয়ে জমাট রক্ত

নির্গত হল। লোকটি এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, যদি এ জমাট মাংসপিণ্ড তাদের পেটে থেকে যেত তবে তাদেরকে দোযখ খেয়ে নিত।

গীবতের সংজ্ঞা ঃ গীবত বলা হয় অপরের এমন আলোচনা করা– যা সে শুনলে খারাপ মনে করে। এ আলোচনা অপরের দৈহিক ত্রুটি, বংশগত ত্রুটি, চারিত্রিক ত্রুটি অথবা কথা, কর্ম, ধর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহ, সওয়ারীর দোষ সম্পর্কিত হলেও গীবত।

কেউ কেউ বলেন ঃ কারও দ্বীনদারী সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়। কেননা, এতে আল্লাহ তাআলা যে বিষয়কে মন্দ বলেছেন, তার নিন্দা করা হয়। দেখ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে যখন জনৈকা মহিলার আলোচনা করা হয় যে, সে অনেক নামায রোযা করে, কিন্তু সাথে সাথে প্রতিবেশীদেরকে জিহ্বা দ্বারা জ্বালাতন করে, তখন তিনি বললেন ঃ সে দোযখে যাবে। অতএব এ ধরনের সমালোচনা নিষিদ্ধ হলে তিনি অবশ্যই নিষেধ করে দিতেন যে, এরূপ আলোচনা করো না, কিন্তু আমরা বলি, এ উক্তি ও তার দলীল ঠিক নয়। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম যে আলোচনা করতেন, তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য কাউকে অপমানিত কিংবা নিন্দা করা ছিল না; বরং মাসআলার সত্যাসত্য জেনে নেয়া লক্ষ্য ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মজলিস ছাড়া অন্য কোথাও এর প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া এসব বিষয়ও যে অন্য স্থানে গীবতের মধ্যে দাখিল, এ বিষয়ে আলেমগণের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গীবতের সংজ্ঞা এরূপই বর্ণনা করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ তোমরা জান গীবত কাকে বলে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ –তোমার ভাইয়ের এমন আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে।' সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়, তা যদি তার মধ্যে থাকে? তিনি বললেন ঃ সে বিষয় তার মধ্যে থাকলেই তো গীবত। না থাকলে তা আরও বড় অন্যায়; অর্থাৎ অপবাদ হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈকা মহিলা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, সে বেঁটে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আয়েশা, তুমি তার গীবত করেছ।

জানা উচিত, গীবত মুখে বলার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং যে পন্থায় কেউ অপরের দোষ জেনে নিতে পারে, তা-ই গীবতের মধ্যে দাখিল হবে– ইঙ্গিতে অথবা বিদ্রূপাত্মক অনুকরণের মাধ্যমে হোক। হযরত

আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একবার এক মহিলা আগমন করল। সে যখন চলে গেল, তখন আমি হাতে ইশারা করে প্রকাশ করলাম, সে বেঁটে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি তার গীবত করেছ। যদি কেউ খোঁড়া ব্যক্তির বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ করে, তবে এটাও গীবত; বরং গীবতের চেয়েও বেশী। কেননা, এতে আসল আকারের চেয়ে বাড়িয়ে দেখানো হয়। যদি কোন লেখক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু লেখে কিংবা তার বাক্য পুস্তকে উদ্ধৃত করে, তবে এটাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কোন কারণ অথবা ওযর লেখে দিলে গীবত হবে না। নাম নির্দিষ্ট না করে যদি "কিছু লোকে বলে" লেখা হয়, তবে গীবত হবে না। যদি বলা হয়, "যার সাথে আজ দেখা হয়েছিল" অথবা "যে আমার কাছে এসেছিল" তবে গীবত হবে। কেননা, সম্বোধিত ব্যক্তি এতেই লোকটিকে চিনে নেবে, কিন্তু নির্দিষ্ট হয় না, এমনভাবে বললে তাতে গীবত হবে না। যেমন– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন ব্যক্তির কাজ খারাপ মনে করতেন, তখন এভাবে বলতেন ঃ মানুষের কি হল, তারা এমন এমন কাজ করে?

গীবত শুনার পর বিস্ময় প্রকাশ করাও গীবত। কেননা, বিস্ময় প্রকাশ করলে গীবতকারী আনন্দিত হয় এবং আরও বেশী বলতে উদ্যত হয়। বরং চুপচাপ শ্রবণ করাও গীবতের মধ্যে দাখিল।

হাদীসে আছে ঃ اَلْمُسْتَمِعُ اَحَدُ الْمُغْتَابِيْنَ

–শ্রোতাও গীবতকারীদের একজন।

শ্রোতার উচিত মুখে গীবত করতে নিষেধ করা। এতে সক্ষম না হলে অন্তরে খারাপ মনে করা। নিষেধ করা সম্পর্কে হাদীসে আছে-

مَنْ اُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ اَذَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ -

–যার নিকটে কোন মুমিনকে অপদস্থ করা হয় এবং সাহায্য করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সে সাহায্য না করে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন সকলের সামনে তাকে অপদস্থ করবেন।

হযরত আবু যরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন-

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ بِالْغَيْبِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَذُبَّهُ عَنْ عِرْضِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

–যে তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইযযতের উপর হামলা

প্রতিহত করে, কেয়ামতের দিন তার ইযযত রক্ষা করা আল্লাহ্ তাআলার জন্যে জরুরী হয়ে পড়ে।

গীবতের কারণ ঃ গীবতের কারণ মোটামুটি এগারটি। তন্মধ্যে আটটি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান এবং তিনটি ধর্মপরায়ণ লোকদের মধ্যে বিদ্যমান। আটটির মধ্যে–

প্রথমতঃ, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মেটানোর জন্যে অপরের গীবত করা হয়। এর কারণে কখনও বাহ্যতঃ মন্দ বলা হয় না, কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষ থেকে যায়; ফলে ভবিষ্যতে সদাসর্বদা মন্দ বলার ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ অপরের দেখাদেখি এবং তার হাঁ-র সাথে হাঁ মেলানোর জন্যে গীবত করা হয়। উদাহরণতঃ আপন সঙ্গী কারও সম্পর্কে মন্দ আলোচনা করলে মনে করা হয়, তার মত না বললে সে নারাজ হয়ে যাবে কিংবা সঙ্গ ত্যাগ করবে। তখন তার কথার মত কথা বলা হয় এবং একে উত্তম সামাজিকতা ও মিশুকতা গণ্য করা হয়।

তৃতীয়তঃ পূর্ব সতর্কতার কারণে গীবত করা হয়। অর্থাৎ যখন কেউ বুঝতে পারে, অমুক ব্যক্তি কোন বড়লোকের সামনে তার দোষ বর্ণনা করবে কিংবা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন পূর্ব থেকেই সে তার দোষ বর্ণনা করতে শুরু করে, যাতে তার সম্পর্কে কিছু বলা হলে তা শ্রবণযোগ্য না হয়।

চতুর্থতঃ কোন দোষ থেকে নির্দোষ হওয়ার লক্ষ্যে গীবত করা হয়। এমতাবস্থায় অপর ব্যক্তির নাম নিয়ে বলা হয়, সেও তো এরূপই করেছে কিংবা এ কাজে সে আমার সহযোগী ছিল।

পঞ্চমতঃ গর্ব ও আস্ফালনের ইচ্ছায় গীবত করা হয়, যাতে অপরকে হেয় বলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা যায়; যেমন কারও সম্পর্কে বলা, সে তো মূর্খ, কিছুই বুঝে না। এর উদ্দেশ্য থাকে, তার তুলনায় আমি বেশী জানি।

ষষ্ঠতঃ হিংসার কারণে গীবত করা হয়; অর্থাৎ যখন কাউকে দেখে, মানুষ তার প্রশংসা ও সম্মান করে, তখন হিংসার অনল প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং অন্য কিছু করার ক্ষমতা না থাকায় তার দোষ প্রকাশ করতে শুরু করে, যাতে মানুষ তার সম্মান ও প্রশংসা থেকে বিরত থাকে।

সপ্তমতঃ ক্রীড়া কৌতুকের বশবর্তী হয়ে গীবত করা হয়। এতে

অপরের দোষ বর্ণনা করে নিজে হাসা, অপরকে হাসানো এবং সময় ক্ষেপণ করা লক্ষ্য থাকে।

অষ্টমতঃ অপরকে ঘৃণার পাত্র করার লক্ষ্যে গীবত করা। এটা সামনে এবং পশ্চাতে উভয়ভাবে হয়।

যে তিনটি বিষয় বিশেষ দ্বীনদার শ্রেণীর মধ্যে গীবতের হয়, সেগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম। বাহ্যতঃ কল্যাণমূলক কথা, কিন্তু শয়তান তাতে অনিষ্টও মিশ্রিত করে দেয়।

প্রথম, কারও দ্বীনদারীর ত্রুটি অবগত হয়ে বিস্মিত হওয়া এবং এরূপ বলা যে, অমুকের ব্যাপার আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছে। যদিও ধার্মিক ব্যক্তির ত্রুটি বিস্ময়ের কারণ হয়ে থাকে, কিন্তু অপর ব্যক্তির উচিত ছিল তার নাম না বলে বিস্ময় প্রকাশ করা। এখানে নাম বলাটা শয়তানের কাজ।

দ্বিতীয়, কারও ত্রুটি দেখে দয়াপরবশ হওয়া এবং দুঃখ করা। উদাহরণতঃ কাউকে দূষণীয় কাজে লিপ্ত দেখে দয়ার ছলে বলা– তার অবস্থার প্রতি আমার খুব দুঃখ হয়। এখানে দুঃখের দাবী করা তার জন্যে শুদ্ধ হলেও তার নাম উচ্চারণ করার কারণে গীবতের মধ্যে দাখিল হয়ে গেছে।

তৃতীয়, আল্লাহর ওয়াস্তে কারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা; অর্থাৎ কাউকে খারাপ কাজ করতে দেখার পর ধর্মের কারণেই ক্রোধ দেখা দেয়। এতে তার নাম উচ্চারণ করে ক্রোধ প্রকাশ করলে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে "সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ" নীতির ভিত্তিতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং অন্যকে জানতে না দেয়া। এ তিনটি কারণ এত সূক্ষ্ম যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়; এমনকি, আলেমদের পক্ষেও সুকঠিন।

গীবত থেকে আত্মরক্ষার উপায় ঃ সচ্চরিত্রতার চিকিৎসা এলেম ও আমলের ওষুধ দ্বারা হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক রোগের ওষুধ তার কারণের খেলাফ হয়; অর্থাৎ কারণ শৈত্য হলে চিকিৎসা উত্তাপ দ্বারা হবে। উপরে গীবতের কারণ সমূহ বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এখন জানা উচিত, গীবত থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখার উপায় দু'টি– একটি সংক্ষিপ্ত ও অপরটি বিস্তারিত। সংক্ষিপ্ত উপায় হচ্ছে, মানুষ এ কথা বিশ্বাস করে নেবে যে, সে গীবতের কারণে আল্লাহর গযবে পতিত হবে; যেমন উপরে বর্ণিত হাদীস

ও মহাজন উক্তিসমূহ থেকে জানা যায়। আরও বিশ্বাস করবে, কেয়ামতের দিন গীবতকারীর কাছে পুণ্য না থাকলে বদলাস্বরূপ অপর ব্যক্তির গোনাহ তার আমলনামায় লেখে দেয়া হবে। ফলে সে দোযখীই হবে। এক রেওয়ায়াতে আছে– কেউ হযরত হাসান (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি শুনেছি, আপনি নাকি আমার গীবত করেন? তিনি বললেন ঃ আমার দৃষ্টিতে তোমার এত মূল্য নেই যে, নিজের পুণ্যসমূহ তোমাকে সমর্পন করব। মোট কথা, মানুষ যখন গীবত সম্পর্কিত হাদীসগুলো বিশ্বাস করে নেবে, তখন ভয়ে গীবত করার জন্যে মুখ খুলবে না।

আর একটি তদবীর হচ্ছে, যখন গীবত করার খেয়াল হয়, তখন মনে মনে ভাববে, নিজের মধ্যেও কোন দোষ আছে কি না? যদি কোন দোষ পায়, তবে তা দূর করার চেষ্টায় মশগুল হয়ে যাবে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি স্মরণ করবে طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ। –সে ব্যক্তির জন্যে সুসংবাদ, যার নিজের দোষ তাকে অপরের দোষ থেকে ফিরিয়ে রাখে। যখন নিজের মধ্যে দোষ থাকে, তখন নিজের দোষকে খারাপ না বলে অপরের দোষকে খারাপ বলতে তার লজ্জা করা উচিত। কারও ইচ্ছাধীন দোষের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। নতুবা কোন সৃষ্টিগত আঙ্গিক ত্রুটির কারণে কাউকে মন্দ বলা স্রষ্টাকে মন্দ বলারই নামান্তর।

আর একটি পন্থা হচ্ছে, একথা চিন্তা করা যে, যদি কোন ব্যক্তি আমার গীবত করে, তবে আমার কাছে তা কতটুকু খারাপ মনে হবে। সুতরাং আমি যদি অন্যের গীবত করি, তবে তার কাছেও ব্যাপারটি তেমনি দুঃখজনক হবে। অতএব নিজের গীবত অন্যে করলে যেমন তাকে পছন্দ করা হয় না, তেমনি অপরের গীবত করাও অপছন্দ করা দরকার।

বিস্তারিত উপায় হচ্ছে, যে কারণে গীবত করা হয়, সে কারণই দূর করতে হবে। কেননা, কারণ দূর হয়ে গেলেই ব্যাধি দূর হয়ে যায়। অতএব গীবতের কারণ যদি ক্রোধ হয়, তবে তা থেকে বাঁচার জন্যে মনে মনে এরূপ চিন্তা করবে– যদি আমি তার উপর রাগ ঝাড়ি, তবে আল্লাহ তাআলা গীবতের কারণে আমার উপর রাগ ঝাড়বেন। কেননা, তিনি গীবত না করার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তার আদেশ অমান্য করেছি। কোন এক নবীর সহীফায় বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান, যখন তোমার ক্রোধ হয়, তখন আমাকে স্মরণ কর। আমি আমার ক্রোধের সময় তোমাকে স্মরণ করব।

গীবতের কারণ যদি দেখাদেখি ও বন্ধুদের মন রক্ষা করা হয়, তবে জানা উচিত, যে বিষয়ে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, তাতে যদি মানুষ সন্তুষ্ট হয়, তবে লাভ কি? বান্দা অপরের কারণে আপন প্রভুর সাথে সম্পর্ক নষ্ট করবে, এটা কিরূপে সম্ভব? এরূপ করলে তার মত নির্বোধ ও নিমকহারাম কেউ হবে না।

গীবতের কারণ যদি নিজেকে পবিত্র ও নির্দোষ করা হয়, তবে চিন্তা করবে, মানুষের অসন্তুষ্টির তুলনায় আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি অনেক বেশী কঠোর। গীবতের কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি তো নিশ্চিত, কিন্তু গীবতের পর মানুষ তাকে নির্দোষ মনে করবে কি না, তা অনিশ্চিত। অতএব আমি হারাম খেয়েছি, তাতে কি হয়েছে; অমুক ব্যক্তিও তো হারাম খায়– এ কথা বলার কোন ফায়দা নেই। কেননা, সে ব্যক্তির অনুসরণই উপকারী হয়, যে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক কাজ করে। যে ব্যক্তি এর বিপরীত কাজ করে, তার অনুসরণ কখনও করা উচিত নয়- সে যে কেউ হোক না কেন। মনে কর, কোন ব্যক্তি প্রজ্বলিত আগুনে ঝাঁপ দেয়। তোমার এ আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা থাকলেও কি তুমি তাতে ঝাঁপ দেবে? যদি দাও, তবে নির্বোধ কথিত হবে। চিন্তার বিষয়, নিজের ওজর বর্ণনা করার জন্যে যে ব্যক্তি অপরের নাম নেয়, সে দ্বিগুণ গোনাহ করে– একটি গীবত, অপরটি তার ওযর। কেননা, কথায় বলে عُذرِ گُناهْ بَدتَراز گُناهْ –গোনাহের ওযর আরও বড় গোনাহ।

গীবতের কারণ যদি অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা হয়, তবে চিন্তা করবে, গীবতের কারণে আল্লাহর কাছে যে মর্তবা ছিল, তা তো বিনষ্ট হল। এখন মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ হওয়া একটি অনিশ্চিত ব্যাপার। বরং তার প্রতি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাওয়াও সম্ভবপর। কারণ, তারা দেখবে, সে অপরের দোষ বের করার কাজে লিপ্ত থাকে।

গীবতের কারণ যদি হিংসা হয়, তবে ভাবতে হবে, এর ফলে দুটি আযাব নিজের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে– এক, দুনিয়াতে হিংসার অনলে দগ্ধ হওয়া এবং দুই, আখেরাতে গীবতের আযাবও ঘাড়ে চাপানো হবে।

আন্তরিক গীবতও হারাম ঃ প্রকাশ থাকে যে, মুখে খারাপ বলা যেমন হারাম, তেমনি অন্তরে কুধারণা পোষণ করাও হারাম। কুধারণার অর্থ হচ্ছে অন্তরে ইচ্ছাপূর্বক অপরকে মন্দ মনে করে নেয়া। যদি মনের সংলাপস্বরূপ কাউকে মন্দ মনে করা হয়, তবে তা মাফ; বরং সন্দেহ

করাও মাফ। যা নিষিদ্ধ, তা হচ্ছে ظَنّ অর্থাৎ মন্দ বলে ধারণা করার প্রতি মনের ঝুঁকে পড়া।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

–হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ্।

কুধারণা হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে, অন্তরের রহস্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। অতএব অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে অন্তরে কুধারণা প্রতিষ্ঠিত করে নেয়ার অধিকার বান্দার নেই। হাঁ, যখন কারও মধ্যে কুবস্তু এমনভাবে প্রত্যক্ষ করা হয় যে, তাতে দ্ব্যর্থবোধকতার অবকাশ থাকে না, তখন অবশ্য কুধারণা করা যায়, কিন্তু এর আগে কারও সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা শয়তানের কাজ। তাই একে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। মনে কর, এক ব্যক্তির মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। এতেই সে মদ খেয়েছে বলা যায় না। হতে পারে সে মদ দিয়ে কুলি করেছে অথবা কেউ জোরেজবরে তার মুখে লাগিয়ে দিয়েছে, সে পান করেনি। এসব সম্ভাবনা সত্ত্বেও আন্তরিক বিশ্বাস করা এবং মুসলমানের প্রতি কুধারণা পোষণ করা অনুচিত।

হাদীসে আছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوْءِ

–আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন মুসলমানের রক্ত, তার ধনসম্পদ এবং তার প্রতি কুধারণা পোষণ।

এ থেকে জানা গেল, যেসব প্রমাণের ভিত্তিতে মুসলমানের ধনসম্পদ ও রক্ত বৈধ হয়, কুধারণাও সেগুলো দ্বারাই বৈধ হয়। অর্থাৎ যখন চোখে দেখে নেয় অথবা আদেল সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়। এ ছাড়া মনে কুধারণা এলে তা দূর করা উচিত এবং মনকে বুঝানো দরকার, এ ব্যক্তির অবস্থা আজ পর্যন্ত তোর কাছে গোপন রয়েছে। যে কারণে এখন তুই কুধারণা করছিস, এতেও ভাল-মন্দ উভয় প্রকার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং অযথা মন্দের দিকে যাওয়া এবং অন্তরে তাই বিশ্বাস করার প্রয়োজন কি? প্রশ্ন হয়, সন্দেহ তো মানুষের মনে ঘোরাফেরা করতেই থাকে এবং অন্তরের সংলাপও চলে। এমতাবস্থায় কোনটি "যন" তথা ধারণা, তা কিরূপে জানব? এর কিছু আলামত বলা দরকার। জওয়াব হচ্ছে, ধারণা শক্তিশালী

হওয়ার আলামত হচ্ছে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে পূর্বেকার বিশ্বাস দূর হয়ে যাওয়া, অন্তরে তার প্রতি কিছুটা ঘৃণাভাব উদ্রেক হওয়া, কাছে বসলে অসহনীয় মনে হওয়া, সম্মান ও খাতির হ্রাস পাওয়া এবং সে কোন গোনাহ করলে দুঃখিত না হওয়া। এসব আলামত পাওয়া গেলে বুঝে নেবে, অপরের প্রতি তুমি কুধারণার বশবর্তী হয়েছ। কুধারণা দূর করার উপায়, কোন মুসলমানের প্রতি কুধারণা হলে পূর্বের তুলনায় তার সম্মান ও খাতির বেশী করবে এবং তার জন্যে উত্তম দোয়া করবে। এতে কুধারণা লোপ পাবে।

গীবত জায়েয হওয়ার কারণাদি ঃ জানা উচিত, অপরের নিন্দা করার পেছনে যদি কোন বিশুদ্ধ ও শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য থাকে, তবে সেই গীবতে গোনাহ হয় না– এরূপ উদ্দেশ্য ছয়টি হতে পারে।

প্রথম, জুলুমের বিচারপ্রাপ্তির জন্যে গীবত করা। উদাহরণতঃ মজলুম ব্যক্তি যদি উচ্চতম শাসনকর্তাকে বলে যে, অমুক নিম্ন পর্যায়ের শাসক আমার উপর জুলুম করেছে, খেয়ানত করেছে অথবা আমার কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছে, তবে এটা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়। কেননা, এটা না করলে বিচার পাওয়া যাবে না, কিন্তু মজলুম ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ বললে গীবত হবে। মজলুমের জন্যে জালেমের নিন্দা করা দুরস্ত।

হাদীসে আছে- إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا –হকদারের জন্যে কথা বলার অধিকার আছে।

দ্বিতীয়, মন্দ বিষয় দূর করা অথবা গোনাহগারকে সৎপথে আসার জন্যে গীবত করা; যেমন একবার হযরত ওমর (রাঃ) যখন হযরত ওসমান কিংবা তালহার কাছ দিয়ে গমন করেন এবং তাঁকে "আসসালামু আলাইকুম" বলেন, তখন তিনি জওয়াব দিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) এ বিষয়ে হযরত আবু বকরের কাছে অভিযোগ করলে তিনি নিজে তাঁদের কাছে গিয়ে মাঝে উভয়ের সন্ধি করে দেন। এ অভিযোগ সাহাবায়ে কেরামের মতে গীবত ছিল না। কেননা, এর উদ্দেশ্য ছিল সন্ধি স্থাপন করা।

তৃতীয়, কোন মাসআলায় শরীয়তের বিধান জানার জন্যে গীবত করা। উদাহরণতঃ কেউ মুফতীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমার পিতা, ভ্রাতা অথবা পত্নী আমার উপর জুলুম করেছে। এখন শরীয়তের আইনে আমার কি করা উচিত? এক্ষেত্রেও সাবধনতা এটাই যে, ইঙ্গিতে প্রশ্ন করবে; যেমন বলবে– আপনি এ সম্পর্কে কি বলেন, এক ব্যক্তির উপর

তার কোন আত্মীয় জুলুম করেছে, এখন তার কি করা উচিত। যদি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে বলে তবুও জায়েয। বর্ণিত আছে, ওতবার কন্যা হিন্দা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার ও আমার সন্তানদের জন্যে যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ অর্থ সে আমাকে দেয় না। আপনি অনুমতি দিলে আমি এ পরিমাণ অর্থ তার কাছ থেকে গোপনে নিয়ে নেব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ ঠিক যে পরিমাণ অর্থ তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্যে যথেষ্ট হয়, সে পরিমাণ অর্থ তুমি নিতে পার। এখানে হিন্দা তার স্বামীর বিরুদ্ধে কৃপণতা ও জুলুমের আলোচনা করেছে। এতদসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে নিষেধ করেননি। কারণ, তার উদ্দেশ্য ছিল মাসআলা জিজ্ঞেস করা।

চতুর্থ, কোন মুসলমানকে অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে গীবত করা। উদাহরণতঃ একজন আলেম দ্বীনদার ব্যক্তিকে দেখা গেল, সে জনৈক ফাসেক পাপাচারীর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে। এতে আশংকা হল, দ্বীনদার ব্যক্তিও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় সেই পাপাচারীর পাপাচার সম্পর্কে আলেম ব্যক্তিকে বলে দেয়া জায়েয, যাতে সে প্রভাবিত না হয়ে যায়। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি কাউকে চাকর রাখতে চায়, কিন্তু তার কোন দোষ সম্পর্কে সে অবগত নয়। তার কোন বন্ধু চাকরের দোষ সম্পর্কে অবগত। এমতাবস্থায় বন্ধুর জন্যে জায়েয, সে চাকরের দোষ মনিব বন্ধুকে বলে দেবে। এতে যদিও চাকরের ক্ষতি, কিন্তু বন্ধুর উপকারের প্রতি প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে। এমনিভাবে বিবাহের ব্যাপারেও যদি কেউ কারও অবস্থা জিজ্ঞেস করে, তবে যেরূপ জানে, সেরূপই বলে দেয়া উচিত। এক্ষেত্রে দোষ প্রকাশ করা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বলেন ঃ চার ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা গীবত নয়– ১। জালেম শাসক, ২। বেদআতী, ৩। ফাসেক ও ৪। প্রকাশ্য পাপাচারী।

পঞ্চম, যে ব্যক্তি এমন পদবীতে খ্যাত হয়ে গেছে, যার মধ্যে কোন দোষ আছে; যেমন খোঁড়া, অন্ধ, টেকু ইত্যাদি। এসব পদবী বললে গীবত হয় না। হাদীসের রেওয়ায়াতে রাবীদের এরূপ পদবী পাওয়া যায়; যেমন رَوَى اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এসব পদবীকে খারাপ মনে করে না বিধায় এতে গীবত হয় না।

ষষ্ঠ, যার দোষ প্রকাশ করা হয়, সে প্রকাশ্য পাপাচারী হলে গীবত হয়

না। অর্থাৎ যে সর্বসমক্ষে পাপাচার করে এবং তার পাপাচার কারও কাছে গোপন নয়; যেমন মদ্যপায়ী, নারীবৎ পুরুষ ইত্যাদি।

হাদীসে আছে– مَنْ اَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ مِنْ وَجْهِهِ فَلَا غِيْبَةَ لَهُ –যে ব্যক্তি লজ্জাশরমের মুখোশ দূরে নিক্ষেপ করে, তার গীবত গীবত নয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি খোলাখুলি পাপাচার করে, তার কোন ইযযত-হুরমত নেই; অর্থাৎ তার দোষ প্রকাশ করলে মানহানি ও গীবত হবে না, কিন্তু যে গোপনে করে, তার ইযযতের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

গীবতের কাফফারা ঃ গীবতকারীর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে গীবত থেকে তওবা করা; অর্থাৎ স্বীয় কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া, অতঃপর যার গীবত করা হয় তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। এতে আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তির গীবত করা হয়, তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করাই যথেষ্ট। মাফ চাওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রমাণ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই উক্তি ঃ كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ তুমি যার গীবত করছ, তার কাফফারা হচ্ছে, তুমি তার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ কারও মাংস খাওয়ার কাফফারা এটাই যে, তার প্রশংসা করবে এবং তার জন্যে উত্তম দোয়া করবে। আতা ইবনে আবী রাবাহকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ গীবত থেকে তওবা কিভাবে হয়? তিনি বললেন ঃ যার গীবত করা হয় তার কাছে গিয়ে বলবে, আমি যা বলেছিলাম তা প্রলাপোক্তি ছিল। আপনার উপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি হয়েছে। এখন আমি উপস্থিত। ইচ্ছা করলে প্রতিশোধ নিন। নতুবা মাফ করে দিন। এ উক্তিটিই সঠিক। আর যারা বলে, ইযযতের কোন বদলা নেই; এর জন্যে ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব নয়, তাদের উক্তি ঠিক নয়। কেননা, ইযযত নষ্ট হয় এমন গালি দিলে তজ্জন্যে শাস্তি দেয়া হয়। জনৈকা মহিলা অন্য এক মহিলাকে "লম্বা আঁচলওয়ালী" বললে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি তার গীবত করেছ। এখন তার কাছে ক্ষমা চাও। এ থেকে বুঝা গেল, যদি সম্ভবপর হয় ক্ষমা করিয়ে নেয়া দরকার, কিন্তু যদি সে ব্যক্তি নিরুদ্দেশ অথবা মৃত হয়, তবে অবশ্য উত্তম দোয়া করবে এবং পুণ্য কাজের সওয়াব বখশে দেবে।

চোগলখোরী ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ –পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়। আরও

বলেন ঃ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ রূঢ়স্বভাব এবং তদুপরি জারজ। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক বলেন ঃ زَنِيْم -এর অর্থ হচ্ছে, যে জারজ কথা গোপন করে না। এ আয়াত থেকে তিনি একথাও চয়ন করেছেন যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করে না এবং চোগলখোরী করে, সে জারজ। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ পাক বলেছেন وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ –দুর্ভোগ প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে নিন্দাকারীর জন্যে। এই আয়াতে কারও কারও মতে هُمَزَة -এর অর্থ যে চোগলখোরী করে। কোরআনে আবু লাহাবের পত্নীকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (ইন্ধন বহনকারিণী) বলা হয়েছে। কথিত আছে, আবু লাহাবের স্ত্রী চোগলখোরী করত। কাজেই এর অর্থ হল "কথা বহনকারিণী।" কোরআনে আরও বলা হয়েছে ঃ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا –অতঃপর তারা উভয়েই তাদের সাথে খেয়ানত করল এবং তারা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেল না। এ আয়াত হযরত লূত ও হযরত নূহ (আঃ)-এর পত্নীদ্বয়ের শানে নাযিল হয়েছে। হযরত লূত (আঃ)-এর পত্নী যখনই তাদের গৃহে কোন মেহমান আসত, সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে খবর পৌঁছে দিত। তারা সংবাদ পেয়ে সেখানে এসে মেহমানদের সাথে অপকর্ম করতে সচেষ্ট হত। হযরত নূহ (আঃ)-এর পত্নী লোকদের কাছে গিয়ে বলত, নূহ উন্মাদ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সর্বাধিক দুষ্ট সম্পর্কে বলব না? সাহাবীগণ আরজ করলেন ঃ আপনি এরশাদ করুন– সর্বাধিক দুষ্ট কে? তিনি বললেন ঃ যে চোগলখোরী করে করে বন্ধুদের সম্পর্কে ফাটল ধরায় এবং স্বচ্ছ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

চোগলখোরীর যে সংজ্ঞা মানুষের মধ্যে প্রচলিত তা হচ্ছে, এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে এ কথা বলা, অমুক ব্যক্তি তোমাকে এ কথা বলছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে চোগলখোরী এতেই সীমিত নয়; বরং যে বিষয় প্রকাশ করা ভাল নয় তা প্রকাশ করা– যার পক্ষ থেকে বলা হয়, তার কাছে খারাপ লাগুক অথবা যার কাছে বলা হয়, তার কাছে খারাপ লাগুক কিংবা কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে খারাপ মনে হোক। প্রকাশ করাও কথার মাধ্যমে লেখার মাধ্যমে কিংবা ইশারা ইঙ্গিতে হোক। মোট কথা, চোগলখোরী হচ্ছে গোপন তথ্য ফাঁস করা এবং অপছন্দনীয় বিষয় প্রকাশ করা। সুতরাং যখন কারও দৃষ্টি মানুষের অবস্থার উপর পড়ে, তখন তার চুপ থাকা উচিত, কিন্তু যে বিষয়ে কোন মুসলমানের উপকার অথবা কারও গোনাহ্ দূর করা প্রয়োজন, তাতে অবশ্য কথা বলা উচিত।

উদাহরণতঃ যখনই কাউকে কারও ধন-সম্পদ নিয়ে যেতে দেখা যায়, তখন এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া উচিত। এতে ধন-সম্পদের মালিকের প্রতি রেয়াত করা হবে, কিন্তু যদি দেখা যায়, কেউ আপন ধন-সম্পদ গোপন করছে, তখন তা প্রকাশ করে দিলে চোগলখোরী হবে।

মোট কথা, যে ব্যক্তির কাছে উপরোক্ত রূপ চোগলখোরী করা হয়, তার ছয়টি কাজ করা কর্তব্য হয়ে পড়ে।

প্রথম ঃ তার কথা সত্য মনে করবে না। কেননা, যে চোগলখোরী করে, সে ফাসেক। ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ -

–মুমিনগণ, যদি ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে খুব যাচাই করে নাও যাতে মূর্খতাবশতঃ কাউকে বিপদে না ফেলে দাও।

দ্বিতীয় ঃ তাকে চোগলখোরী করতে মানা করবে এবং বলবে, দ্বিতীয় বার আমার কাছে এরূপ কথা বলবে না। কোরআনে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে।

তৃতীয় ঃ তার সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা রাখবে। কারণ, আল্লাহ তার সাথে শত্রুতা রাখেন। আল্লাহ যার সাথে শত্রুতা রাখেন, তার সাথে শত্রুতা রাখা ওয়াজিব।

চতুর্থ ঃ কেবল তার কথায় অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতি কুধারণা পোষণ করবে না। আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা অনেক কুধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক কুধারণা পাপ।

পঞ্চম ঃ তার কথার কারণে তামাশা ও খোঁজাখুঁজি শুরু করবে না। আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَلَا تَجَسَّسُوْا খোঁজাখুঁজি করো না।

ষষ্ঠ ঃ চোগলখোরকে চোগলখোরী করতে নিষেধ করে নিজে তাতে লিপ্ত হবে না। উদাহরণতঃ মানুষের কাছে বলবে না যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে এমন এমন বলে।

মোট কথা, চোগলখোরী পরিহার করা উচিত। এর অনিষ্ট মারাত্মক হয়ে থাকে এবং কুফল বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হাম্মাদ ইবনে সালমা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি গোলাম বিক্রয় করে ক্রেতাকে বলল ঃ এর মধ্যে

কোন দোষ নেই, কিন্তু সে চোগলখোর। খরিদ্দার বলল ঃ আমি এই দোষ মেনে নিলাম। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর গোলাম একদিন প্রভুপত্নীকে বলল ঃ আপনার স্বামী আপনাকে চান না। তিনি এখন অন্য একজন মহিলাকে গৃহে আনতে ইচ্ছুক। আমি একটি মন্ত্র জানি। আপনার স্বামী যখন নিদ্রামগ্ন থাকেন তখন ক্ষুর দিয়ে তার বিছানার কিছু অংশ কেটে আনবেন। আমি তাতে মন্ত্র পড়ে দেব। এতে আপনার স্বামী আপনারই হয়ে থাকবে। প্রভুপত্নী গোলামের এ কথা বিশ্বাস করে নিল। সে স্বামীর ঘুমের অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে ধূর্ত গোলাম প্রভুকে গোপনে বলল ঃ আপনার স্ত্রী ভিন্ন পুরুষের সাথে প্রণয় রাখে এবং সুযোগমত আপনাকে হত্যা করার ফন্দি আঁটছে। যদি পরীক্ষা করতে চান, তবে নিদ্রার বাহানায় বিছানায় শায়িত থেকে লক্ষ্য করুন। প্রভু তার কথায় নিদ্রার ভান করে বিছানায় শুয়ে রইল। পত্নী অপেক্ষায়ই ছিল। সে ক্ষুর নিয়ে স্বামীর দিকে অগ্রসর হল। যখনই সে শিয়রের দিকে নত হল, স্বামী মনে করল এই বুঝি গলা কাটতে চায়। সে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে পত্নীকে হত্যা করল। তার শ্বশুরালায়ে সংবাদ পৌঁছলে তারা এসে স্বামীকে হত্যা করল। এর পর এই হত্যাকাণ্ড স্বামী ও স্ত্রীর আত্মীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সামান্য একটু চোগলখোরীর কারণে এত বড় অঘটন ঘটে গেল।

দ্বিমুখী কথা ঃ উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি পরস্পরে শত্রু এমন দু'ব্যক্তির সাথে পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ করে প্রত্যেকের সাথে তার পছন্দসই কথা বলে। এটা সাক্ষাৎ মোনাফেকী। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেন, তিনি বলেন ঃ

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانٌ مِّنْ نَّارٍ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ

–দুনিয়াতে যার দু'রকম চেহারা হবে, কেয়ামতের দিন তার দু'টি আগুনের জিহ্বা হবে।

অযথা প্রশংসা ঃ এটাও কতক স্থানে নিষিদ্ধ। প্রশংসার মধ্যে ছয়টি বিপদ আছে। তন্মধ্যে চারটি যে প্রশংসা করে তার সাথে এবং দু'টি যার প্রশংসা করা হয় তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত। প্রশংসাকারীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত চারটি বিপদের প্রথম, প্রশংসায় এত বাড়াবাড়ি করে যে, তা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়ে যায়। খালেদ ইবনে মেদান বলেন ঃ যে ব্যক্তি জনসমক্ষে কারও এমন বিষয়ে প্রশংসা করে, যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাআলা

তাকে কেয়ামতের দিন তোতলা করে উত্থিত করবেন।

দ্বিতীয় ঃ প্রশংসার মধ্যে কখনও রিয়ার দখল থাকে। উদাহরণতঃ প্রশংসায় প্রশংসিত ব্যক্তির সাথে মহব্বত প্রকাশ পায়, কিন্তু অন্তরে তার মহব্বত মোটেই থাকে না। ফলে সে রিয়াকার ও মোনাফেক হয়ে যায়।

তৃতীয় ঃ প্রশংসায় কতক গুণ এমন বর্ণনা করা, যেগুলো প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে আছে কিনা সে সম্পর্কে সে ওয়াকিফহাল নয়; যেমন কাউকে মুত্তাকী, পরহেযগার, দরবেশ ইত্যাদি বলে প্রশংসা করা। এ ধরনের গুণাবলী অপ্রকাশ্য এবং অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে অপরের প্রশংসা করতে শুনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তার সাথে সফর করেছ? কখনও ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন করেছ? অথবা সে কি তোমার প্রতিবেশী? লোকটি আরজ করল ঃ এসব বিষয়ের মধ্যে কোনটিই নেই। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি তার প্রশংসা করো না।

চতুর্থ ঃ প্রশংসিত ব্যক্তি জালেম ও ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও প্রশংসা করে তাকে খুশী করা হয়। এটা নাজায়েয। হাদীসে আছে, যখন ফাসেকের প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হন। হযরত হাসান বলেন ঃ যে জালেমের দীর্ঘায়ুর জন্যে দোয়া করে, সে যেন কামনা করে, আল্লাহর পৃথিবীতে আরও বেশী জুলুম হোক।

প্রশংসিত ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত দু'টি বিপদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে, প্রশংসার ফলস্বরূপ তার মধ্যে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয়। এগুলো মারাত্মক দোষ। হযরত হাসান বর্ণনা করেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) দোররা নিয়ে বসে ছিলেন এবং সভাসদগণ তাঁর চারপাশে বৃত্তাকারে উপবিষ্ট ছিল। এমন সময় জারুদ ইবনে মুনযির আগমন করল। এক ব্যক্তি বলল ঃ রবীয়া গোত্রের সরদার। কথাটি সকলেরই শ্রুতিগোচর হল। জারুদ নিকটে এলে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে দোররা দিয়ে আস্তে আস্তে প্রহার করলেন। সে আরজ করল ঃ ব্যাপার কি? তিনি বললেন, তুমি শুননি, তোমার সম্পর্কে লোকটি কি বলেছে? জারুদ বলল ঃ শুনেছি তো। তিনি বললেন ঃ আমার আশংকা হল, তুমি এতে আত্মম্ভরী হয়ে যাবে। তাই তোমার অহংকার হ্রাস করার জন্যে আমি এ কাজ করেছি।

দ্বিতীয় ঃ বিপদ হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন প্রশংসা দ্বারা জানবে, সে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে গেছে, তখন আপন অবস্থার উন্নতি সাধনে অলসতা করবে। কেননা, উন্নতি সাধনের চেষ্টা সে-ই করে, যে নিজের মধ্যে ত্রুটি আছে বলে জানে, কিন্তু যখন মানুষের মুখে প্রশংসাই শুনবে,

তখন নিজের সম্পর্কে কামেল হওয়ার ধারণা করে নেবে এবং আমল করার প্রয়োজন অনুভব করবে না। এ কারণেই এক হাদীসে প্রশংসাকারীকে বলা হয়েছে, তুমি তোমার বন্ধুর গলা কেটে দিয়েছ।

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

إِذَا مَدَحْتَ اَخَاكَ فِىْ وَجْهِهِ فَكَاَنَّمَا اَمْرَرْتَ عَلٰى حَلْقِهٖ مُوْسًى رَمِيْضًا ـ

–তুমি তোমার ভাইয়ের প্রশংসা তার মুখের উপর করে তার গলায় যেন ক্ষুর চালিয়ে দিয়েছ।

হাঁ, প্রশংসা যদি এসব বিপদ থেকে মুক্ত হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই; বরং এরূপ প্রশংসা মোস্তাহাব। সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন। হযরত আবু বকরের শানে তিনি বলেন ঃ

لَوْ وُزِنَ اِيْمَانُ اَبِىْ بَكْرٍ بِاِيْمَانِ الْعَالَمِ لَرَجَحَ

–যদি আবু বকরের ঈমান সারা বিশ্বের ঈমানের সাথে ওজন করা হয়, তবে তাঁর ঈমানই ভারী হবে।

হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

لَوْلَمْ اُبْعَثْ لَبُعِثْتَ يَا عُمَرُ

–যদি আমি পয়গম্বর না হতাম তবে তুমি পয়গম্বর হতে। এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি হতে পারে? কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) অন্তশ্চক্ষু দিয়ে জেনে নিয়েছিলেন, এই প্রশংসার কোন কুফল দেখা দেবে না।

আপন প্রশংসা শুনার পর প্রশংসিত ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত, জীবনের শেষ মুহূর্তটি খুব নাজুক ও বিপদসংকুল। আমলের উপর কোন ভরসা করা যায় না। রিয়া ইত্যাদি কত প্রকারের বিপদাশংকা রয়ে গেছে। এরপর নিজের দোষ সম্পর্কেও চিন্তা করবে, যা সে নিজে জানে এবং প্রশংসাকারী জানে না। নিজের রহস্য ও অন্তরের অবস্থা চিন্তা করলে সে বাধ্য হয়ে প্রশংসাকারীকে বিরত রাখবে এবং তাকে লাঞ্ছিত করবে।

হাদীসে আছে ঃ اُحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ

–প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর।

সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের হাল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, প্রশংসা তার জন্যে ক্ষতিকর হয় না। জনৈক বুযুর্গ আপন

প্রশংসা শুনে বললেন ঃ ইলাহী, এরা আমার অবস্থা জানে না, কিন্তু তুমি জান। কেউ হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রশংসা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ, যে বিষয় তারা জানে না এবং আমার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে, তজ্জন্যে আমাকে পাকড়াও করো না। আমাকে ক্ষমা কর এবং তাদের ধারণার চেয়েও উত্তম কর।

কথাবার্তার সূক্ষ্ম ভুল-ভ্রান্তি ঃ সাধারণতঃ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়াদিতে আলেম ব্যক্তি সঠিক ভাষায় কথাবার্তা বলে, অজ্ঞ জনসাধারণ এসব ক্ষেত্রে ভুল করে বসে, কিন্তু অজ্ঞতার কারণে এরূপ করা হয় বিধায় আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন। হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

لَا يَقُلْ اَحَدُكُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شِئْتَ -

–তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে– যা আল্লাহ চান ও আপনি চান; বরং এরূপ বলা উচিত, যা আল্লাহ চান, অতঃপর আপনি চান।

উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলার চাওয়ার সাথে অপরকে শরীক করে বলা যাবে না যে, আল্লাহ ও আপনি চাইলে এরূপ হবে। কারণ, এতে অসম্মান ও বেআদবী হয়। এরূপ বলা উচিত, আল্লাহর ইচ্ছা সর্বাগ্রে, এরপর আপনার ইচ্ছা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলল, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল চান। তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক করছ? এরূপ বল ঃ যা আল্লাহ একা চান। ইবরাহীম বলেন, 'আল্লাহর আশ্রয় ও আপনার আশ্রয়' এ কথা বলাও খারাপ। বরং এরূপ বলা জায়েয, আল্লাহর আশ্রয় এরপর আপনার আশ্রয়। ইবরাহীম আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যকে গাধা বলে সম্বোধন করে, কেয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে– বল, আমি কি তাকে গাধা সৃষ্টি করেছিলাম? তুমি তাকে গাধা বলতে কেন?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কতক লোক কথায় কথায় শেরক করে বসে। তারা বলে ঃ এ কুকুরটি না থাকলে আজ রাতে সর্বস্ব চুরি হয়ে যেত। তারা সত্যিকার রক্ষকের প্রতি লক্ষ্য করে না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন "আমার বান্দা" ও "আমার বাঁদী" না বলে। কেননা, বান্দা সকলেই আল্লাহর এবং বাঁদীও তাঁরই। এক্ষেত্রে "আমার

গোলাম" বলা উচিত। গোলামও তার প্রভুকে "রব" (পালনকর্তা) বলবে না; বরং প্রভু ও সরদার বলবে। কেননা, সকলের পালনকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা।

সাধারণ মানুষের প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তাআলার গুণাবলী ও কালাম নিত্য না অনিত্য– এ জাতীয় প্রশ্ন সাধারণ মানুষের করা উচিত নয়; বরং কোরআনে যে সকল আদেশ নিষেধ রয়েছে, সেগুলো মেনে চলাই তাদের কাজ, কিন্তু এটা মনের উপর কঠিন এবং অনর্থক কথাবার্তা খুব সহজ মনে হয়। সাধারণ মানুষ অনধিকার চর্চা করে আনন্দিত হয়। কারণ, শয়তান তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় যে, তারা আলেম ও জ্ঞানীজন। অথচ তাদের মুখ দিয়ে অজ্ঞাতে কতক কুফরী কালেমাও উচ্চারিত হয়ে যায়। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, কোরআন পাকে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান আনা এবং এবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া। কোরআনে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে যেগুলো এবাদতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা ও তর্ক-বিতর্ক করা বেআদবী। এতে কুফরের আশংকা থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন সূক্ষ্ম আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করে, যা হৃদয়ঙ্গম করতে তার জ্ঞান-বুদ্ধি অপারগ, সে সেই বিষয়ে মূর্খদের স্তরে পরিগণিত হবে এবং শাস্তিযোগ্য ও নিন্দনীয় হবে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে –

ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ -

–আমি যে বিষয়ে বলা বর্জন করেছি, তা আমার মধ্যেই সীমিত থাকতে দাও। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা অযথা প্রশ্ন করেছে এবং পয়গম্বরদের সাথে মতবিরোধ করেছে। আমি যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি, তা থেকে বেঁচে থাক এবং যা করতে আদেশ করি, তা যথাসম্ভব পালন কর।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– একদিন লোকেরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এতবেশী প্রশ্ন করতে লাগল যে, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন ঃ যত ইচ্ছা প্রশ্ন কর। আমি জওয়াব দেব। সেমতে এক ব্যক্তি সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল ঃ আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা হোযায়ফা। এরপর আরও দু'ভাই দাঁড়িয়ে প্রশ্ন

রাখল, আমাদের পিতা কে? তিনি বললেন ঃ যার সন্তান বলে তোমরা কথিত হও সে-ই তোমাদের পিতা। এরপর আরও একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি জান্নাতে যাব, না দোযখে? তিনি বললেন ঃ দোযখে। যখন সকলেই তাঁর বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি টের পেল, তখন চুপ হয়ে গেল। কারও প্রশ্ন করার সাহস হল না। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ

رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا -

–আল্লাহ আমাদের রব, ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের নবী– এতেই আমরা সন্তুষ্ট। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ওমর, তুমি বসে যাও। মনে হয় তুমি তওফীকপ্রাপ্ত।

অন্য এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমার মনে হয় লোকেরা অধিক প্রশ্ন করতে করতে এক পর্যায়ে বলতে শুরু করবে, মানুষকে তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন কখনও তোলা হলে তোমরা সূরা এখলাস পাঠ করে বাম দিকে তিন বার থুথু ফেলবে এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

হযরত মূসা ও হযরত খিযির (আঃ)-এর কাহিনী থেকে পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয়, অস্থানে প্রশ্ন করা মোটেই সঙ্গত নয় এবং যে বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার বোধশক্তি নেই, তা কখনও জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। কোরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মূসা (আঃ) খিযিরের সাথে ওয়াদা করেছিলেন, স্বেচ্ছায় না বলা পর্যন্ত তিনি কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না। এরপর প্রথমে নৌকার অবস্থা জিজ্ঞেস করতেই খিযির (আঃ) ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। মূসা (আঃ) ওযর পেশ করলেন, ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করুন। আর জিজ্ঞেস করব না, কিন্তু যখন তিন বার এরূপ হল তখন খিযির (আঃ) বলতে বাধ্য হলেন– هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ –এটাই আমার মধ্যে ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের মুহূর্ত।

এরপর তিনি মূসা (আঃ)-কে ত্যাগ করে চলে গেলেন।

সারকথা, জনসাধারণের জন্যে অধিক সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা খুবই বিপজ্জনক। এ থেকে অনেক অনর্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অতএব তাদেরকে বাধা দেয়াই সঙ্গত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্রোধ ও হিংসা

প্রকাশ থাকে যে, ক্রোধ হচ্ছে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যার প্রকৃতি হচ্ছে এই আয়াত ঃ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ –আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয়ের উপর উঁকি মারে।' অগ্নি যেমন ভস্মের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে, তেমনি ক্রোধের হুতাশন অন্তরের ভাঁজে ভাঁজে প্রচ্ছন্ন থাকে। চকমকি পাথরে ঠোকা লাগতেই যেমন অগ্নি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তেমনি অহংকারে সামান্যতম আঘাতেই ক্রোধের অগ্নিও অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুযুর্গগণ ঈমানের নূরের সাহায্যে এ কথা আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের মধ্যে এমন একটি শিরা রয়েছে, যা শয়তানের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এটা ক্রোধাগ্নির পরশ পেয়ে জ্বলে উঠে এবং সত্যের সামনে ঝুঁকে পড়ে। তার বংশগত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা শয়তানের সাথে পাকাপোক্ত। শয়তান বলেছিল ঃ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ –আমাকে সৃষ্টি করেছ অগ্নি দ্বারা এবং আদমকে সৃষ্টি করেছ মৃত্তিকা দ্বারা। মৃত্তিকার স্বভাব হচ্ছে স্থির ও গম্ভীর থাকা। পক্ষান্তরে অগ্নির কাজ হচ্ছে প্রজ্বলিত এবং লেলিহান শিখা হয়ে গতিশীল হওয়া। ক্রোধের মুহূর্তে যখন মানুষও গতিশীল এবং অস্থির হয়, তখন মনে হয় যেন মৃত্তিকা দ্বারা সৃজিত নয়; বরং শয়তানের অনুরূপ তার খামিরও অগ্নি।

ক্রোধের ফল হচ্ছে ঘৃণা ও বিদ্বেষ; অর্থাৎ শত্রুতা ও অপরের অমঙ্গল কামনা। ক্রোধ ও হিংসা দ্বারা অনেক মানুষ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়। তাই ধ্বংসের স্থান বলে দেয়া অত্যাবশ্যক, যাতে এগুলো থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করে এবং অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে অন্তরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। কেননা, মন্দ বিষয় সম্পর্কে না জানা পর্যন্ত মানুষ তাতে লিপ্ত থাকে। কেবল মন্দ বিষয় জানাই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত তা থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ও উপায় না জানা হয়। তাই আমরা এ অধ্যায়ের প্রথমোক্ত কয়েকটি বর্ণনায় ক্রোধের অনিষ্ট, তার স্বরূপ, কারণাদি, প্রতিকার, সহনশীলতার সওয়াব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব। এরপর অবশিষ্ট পরিচ্ছেদসমূহে হিংসা ও বিদ্বেষের অর্থ, ফলাফল, কারণাদি ও প্রতিকার লিপিবদ্ধ করব।

ক্রোধের অনিষ্ট ঃ আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন–

إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ -

–যখন কাফেররা তাদের অন্তরে জেদ পোষণ করে নিল– অজ্ঞতার জেদ, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল ও মুমিনদের উপর স্থিরতা ও গাম্ভীর্য নাযিল করলেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের এ কারণেই নিন্দা করেছেন যে, তারা অন্যায় জেদের বশবর্তী হয়ে মিথ্যার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অন্যান্য জেদও ক্রোধেরই অপর নাম। তিনি স্থিরচিত্ততা ও গাম্ভীর্য নাযিল করার কথা বলে মুমিনদের প্রশংসা করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ আমাকে সামান্য আমল বলে দিন। তিনি বললেন ঃ لَاتَغْضَبْ অর্থাৎ ক্রোধের বশবর্তী হয়ো না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমাকে আল্লাহর ক্রোধ থেকে কিসে রক্ষা করবে? তিনি এরশাদ করলেন ঃ তুমি নিজে ক্রোধ করো না। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ একবার রসূলে করীম (সাঃ) উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা জবরদস্ত পাহলোয়ান কাকে মনে কর? সকলেই আরজ করল ঃ এমন ব্যক্তিকে মনে করি, যে কুস্তিতে কারও সাথে ধরাশায়ী হয় না। তিনি বললেন ঃ সে পাহলোয়ান নয়। জবরদস্ত পাহলোয়ান সে ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে দমিত রাখে। হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন مَنْ كَفَّ غَضَبَهٗ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ - যে আপন ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন রাখেন।

হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ) বলেন ঃ অধিক ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, ক্রোধের আধিক্য অন্তরকে হালকা করে দেয়।

হযরত হাসান বলেন ঃ আদম সন্তান ক্রোধবশতঃ এমন লম্ফঝম্ফ করে যে, মনে হয় এবারের লম্ফে জাহান্নামে পড়ে যাবে। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ রেওয়ায়াত করেন, জনৈক সংসারত্যাগী দরবেশ তার এবাদতখানায় ছিল। শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করতে চাইল, কিন্তু সে আপন কাজে অটল রইল। শয়তান একবার তার কক্ষের কাছে এসে ডেকে বলল

ঃ দরজা খোল। সে জওয়াব দিল, না। শয়তান আবার বলল ঃ দরজা খুলে দাও, নতুবা আমি চলে যাব আর তুমি আফসোস করবে। দরবেশ এতে ভ্রূক্ষেপ করল না। শয়তান বলল ঃ আমি মসীহ্। দরবেশ বলল ঃ তুমি মসীহ্ হলে আমি কি করব? মসীহ্ আমাদেরকে এবাদত ও সাধনার আদেশ করেছেন এবং কেয়ামতে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা করেছেন। ওয়াদার খেলাফ করে যদি আজই চলে আসেন, তবে আমরা মানতে রাজি নই। এরপর শয়তান বলল ঃ আমি শয়তান। তোমাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলাম। তা হল না। এখন তুমি যা জিজ্ঞেস করবে তা বলব। দরবেশ বলল ঃ আমি কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। অতঃপর শয়তান সেখান থেকে প্রস্থানোদ্যত হলে দরবেশ বলল ঃ শুনছ না কি? সে বলল ঃ শুনছি, বল। দরবেশ বলল ঃ মানুষের কোন্ স্বভাবটি তোমাকে অধিক সাহায্য করে। শয়তান বলল ঃ ক্রোধ! মানুষ যখন ক্রোধের বশবর্তী হয়, তখন আমি তাকে এমনভাবে গড়িয়ে দেই, যেমন বালকেরা বলকে গড়িয়ে দেয়। হযরত খায়সামা বর্ণনা করেন– শয়তান বলে, আদম সন্তান আমার উপর প্রবল হতে পারে না। যখন সে সন্তুষ্ট থাকে তখন আমি তার অন্তরে থাকি; আর যখন ক্রোধের বশবর্তী হয়, তখন উড়ে তার মাথায় বসি।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক বলেন ঃ ক্রোধ প্রত্যেক অনিষ্টের চাবি। জনৈক আনসার বলেন ঃ প্রখরতা নির্বুদ্ধিতার শিকড়। এর কারণ ক্রোধ। যে ব্যক্তি মূর্খতায় তুষ্ট থাকে, তার সহনশীলতার প্রয়োজন নেই। কেননা, সহনশীলতা হচ্ছে সজ্জা ও উপকারী বিষয় এবং মূর্খতা দোষ ও ক্ষতির বিষয়। হযরত মুজাহিদ বর্ণনা করেন– শয়তান বলে, আমি আদম সন্তান থেকে কখনও ক্লান্ত হইনি এবং তিনটি বিষয়ে কখনও ক্লান্ত হব না।

প্রথম ঃ যখন সে কোন নেশা পান করবে, তখন তার লাগাম আমার হাতে থাকবে। আমি যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাব। সে আমার মর্জি অনুযায়ী কাজ করবে।

দ্বিতীয় ঃ যখন সে ক্রোধের বশবর্তী হবে তখন এমন কথা বলবে, যা জানে না এবং এমন কাজ করবে, যার কারণে অনুতপ্ত হবে। তৃতীয় ঃ আমি সর্বদা তাকে কৃপণতায় উৎসাহিত করতে থাকি এবং এমন বস্তুর লালসা দেই, যা তার সাধ্যে নেই।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, এতে পরিণামে ক্ষমা চাওয়ার লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। হযরত ইবনে মসঊদ

(রাঃ) রেওয়ায়াত করেন– ক্রোধের সময় সহনশীলতা পরীক্ষা করা এবং লোভের সময় আমানতদারী যাচাই করা উচিত। ক্রোধ না হলে তখনকার সহনশীলতার কি মূল্য। এমনিভাবে লালসার বিষয় ছাড়া আমানতদারীর কোন মূল্য নেই।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) তাঁর জনৈক বিচারককে লেখেন, ক্রোধের সময় কাউকে শাস্তি দিয়ো না। কোন অপরাধীর প্রতি ক্রোধ হলে তাকে বন্দী করে রাখবে। এরপর ক্রোধ দূর হয়ে গেলে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করার পর অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেবে এবং শাস্তিও যেন পনেরটি বেত্রদণ্ডের বেশী না হয়। আলী ইবনে যায়দ হযরত ওমর ইবনে আদুল আজীজের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ একবার জনৈক কোরায়শী ব্যক্তি তাঁকে কটু কথা বললে তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথা নত করে রাখলেন, অতঃপর বললেন ঃ তোমার ইচ্ছা ছিল, আমি ক্ষমতার মোহে শয়তানের কাছে পরাজিত হয়ে আজ তোমার সাথে এমন কথা বলি, যা কাল তুমি আমার সাথে বলবে।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন ঃ কুফরের চারটি স্তম্ভ আছে। এক- ক্রোধ, দুই- খাহেশ, তিন - নির্বুদ্ধিতা এবং চার– লালসা।

ক্রোধের স্বরূপ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রাণীকে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণাদি দ্বারা বিলুপ্ত ও ধ্বংস হওয়ার যোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন। তাই আপন ভাণ্ডার থেকে তাকে এমন একটি বস্তুও দান করেছেন, যদ্দ্বারা সে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলুপ্তি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। আভ্যন্তরীণ কারণাদির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, মানবদেহ উত্তাপ ও আর্দ্রতার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য। উত্তাপ সর্বদাই আর্দ্রতাকে হজম ও শুষ্ক করতে থাকে। যদি আর্দ্রতা খাদ্যের কাছ থেকে সাহায্য না পায় এবং যে পরিমাণ শুষ্ক হয় সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ না হয়, তবে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা খাদ্যকে প্রাণীদেহের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন এবং দেহের মধ্যে খাদ্যের চাহিদা নিহিত রেখেছেন, যাতে সে খাদ্য খায় এবং ক্ষতিপূরণ হয়ে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

পক্ষান্তরে যে বাহ্যিক কারণাদি দ্বারা প্রাণী ধ্বংস হয়, সেগুলো হচ্ছে তরবারির মত অস্ত্র ও অন্যান্য মারণযন্ত্র। এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ক্রোধশক্তি সৃষ্টি করেছেন, যা অন্তর থেকে স্ফুটিত হয় এবং ধ্বংসাত্মক বস্তুসমূহকে প্রতিহত করে। আল্লাহ্ তাআলা এই

ক্রোধকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করে মানুষের মজ্জার উপাদান করে দিয়েছেন। মানুষকে যখন কোন উদ্দেশ্য থেকে বাধা দেয়া হয় অথবা তার মর্জির বিপরীত কোন ঘটনা ঘটে, তখন সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং তার শিখা এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যে, অন্তরের অভ্যন্তরের রক্ত স্ফুটিত হয়ে শিরা উপশিরায় উপরের দিকে ধাবিত হয়; যেমন হাঁড়ির স্ফুটন উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়। এ কারণেই ক্রোধের সময় মানুষের মুখমণ্ডল ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে যায়। মুখমন্ডলের ত্বক নরম ও স্বচ্ছ বিধায় রক্তের ঝলক তাতে খুব পরিস্ফুট হয়। এ অবস্থা তখন হয়, যখন মানুষ নিজের চেয়ে অধস্তন ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হয় এবং প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়, কিন্তু যদি নিজের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির উপর ক্রোধ আসে, যেখানে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয় না, তবে রক্ত ত্বক থেকে জমাট হয়ে অন্তরের দিকে ফিরে যায় এবং মানসিক দুঃখ কষ্টের কারণ হয়। ফলে মুখমন্ডল ফেকাসে হয়ে যায়। আর যদি সমকক্ষ ব্যক্তির উপর ক্রোধ আসে, তবে উপরোক্ত উভয়বিধ অবস্থা দেখা দেয়। মোট কথা, অন্তরের মধ্যেই ক্রোধের স্থান।

এই ক্রোধশক্তিতে মানুষের অবস্থার তিনটি স্তর রয়েছে।

প্রথম ঃ স্বল্পতার স্তর। এটা নিন্দনীয় এবং এরূপ ক্রোধসম্পন্ন ব্যক্তিকেই "বে-গায়রত" বলা হয়ে থাকে। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ যে ক্রোধের ব্যাপার দেখেও ক্রুদ্ধ হয় না সে গাধা। এ থেকে জানা যায়, ক্রোধ ও জেদ মোটেই না থাকা খুবই ত্রুটির বিষয়।

আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় বলেন–

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

–তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। তিনি আপন রসূল (সাঃ)-কে আদেশ করেছেন–

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

–কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। বলাবাহুল্য, কঠোরতা ক্রোধের পরই হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় ঃ বাহুল্যের স্তর। অর্থাৎ ক্রোধ এত প্রবল হওয়া যে, জ্ঞানবুদ্ধি, ধর্মের আনুগত্য ও শাসন ডিঙ্গিয়ে যাওয়া। এই প্রাবল্যের এক কারণ জন্মগত; অর্থাৎ, জন্মের শুরু থেকেই কতক লোক স্পর্শকাতর ও ত্বরিত রাগী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় কারণ অভ্যাসগত; অর্থাৎ এমন লোকদের সাথে উঠাবসা ও চলাফেরা করা, যারা ক্রোধের হাতে পরাভূত, ত্বরিত

প্রতিশোধ গ্রহণকারী, ক্রুদ্ধ হওয়াকে বীরত্ব মনে করে এবং যারা গর্বভরে বলে, আমরা কোন কিছু বরদাশত করতে পারি না, সামান্য কথাও না। অথচ তারা যেন বাস্তবে একথাই বলে, আমাদের মোটেই জ্ঞানবুদ্ধি নেই। যে ব্যক্তি এসব লোকের কাছ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে থাকে, তার অন্তরে ক্রোধ সুন্দর হয়ে প্রতিভাত হয়। ফলে সেও তেমনি হয়ে যেতে চায়।

যখন ক্রোধের অনল প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, তখন উপদেশ কোন কাজে আসে না; বরং উপদেশ দিলে ক্রোধ আরও বেড়ে যায়। বুদ্ধি দ্বারা যে কিছু উপকৃত হবে– এটাও হতে পারে না। কেননা এ সময় বুদ্ধির নূর নির্বাপিত হয়ে যায় অথবা ক্রোধের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তাই এ অবস্থায় মানুষ মস্তিষ্ক দ্বারা চিন্তা করে, কিন্তু যখন ক্রোধের আতিশয্যে অন্তরে রক্ত টগবগ করে উঠে, তখন তা থেকে একটি কালো ধোঁয়া মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয়ে চিন্তার জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে; রবং মাঝে মাঝে ইন্দ্রিয়ের জায়গাকেও ঘিরে নেয়। ফলে চোখে কিছু দেখে না এবং কানে কিছু শুনে না। পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়।

মাঝে মাঝে ক্রোধের অগ্নি এত প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে, দেহের আর্দ্রতা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। সত্যি বলতে কি, ঝড়ের সময় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে নৌকার যে অবস্থা হয়, তা অন্তরের সেই অবস্থার তুলনায় অনেক ভাল, যা ক্রোধের সময় হয়ে থাকে। কেননা নৌকার বেঁচে যাওয়ার আশা থাকে। নৌকারোহীরা নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্যে নৌকা থামিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু এখানে তো নৌকার মাঝি অন্তর, যা ক্রোধের আতিশয্যে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। এমতাবস্থায় চেষ্টা তদবীর করবে কে?

এখন জানা উচিত, ক্রোধাতিশয্যের বাহ্যিক আলামত হচ্ছে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, হাত-পা কাঁপতে থাকা, অসংলগ্ন কাজকর্ম করা, অসমাপ্ত কথা বলা, মুখে শ্লেষ্মা আসা, চুক্ষ রক্তবর্ণ ধারণ করা এবং নাক মুখ স্ফীত হয়ে মুখাকৃতি বদলে যাওয়া। যদি ক্রুদ্ধ ব্যক্তি ক্রোধের সময় আপন মুখমন্ডল দেখত, তবে লজ্জায় ক্রোধ বর্জন করতে বাধ্য হত। বাহ্যিক অবয়ব যেহেতু আন্তরিক অবয়বের শিরোনাম হয়ে থাকে, তাই বুঝা যায়, অন্তরের অবস্থা আরও বিশ্রী হবে। কেননা, প্রথমে অন্তরের অবয়বই বিগড়ে যায়, যা পরে বাহ্যিক অবয়বেও বিস্তৃত হয়। ক্রোধের প্রভাবে জিহ্বার অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অনর্গল অকথ্য ও অশ্লীল

গালিগালাজ করতে থাকে, যা শুনে বুদ্ধিমানরা লজ্জাবোধ করে; এমনকি ক্রোধ থেমে গেলে স্বয়ং ক্রুদ্ধ ব্যক্তিও লজ্জিত হয়। ক্রোধের প্রভাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং দ্বিধাহীনভাবে মারপিট, নখে আঁচড়ানো, হত্যা, জখম ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে। যার উপর ক্রোধ আসে, সে সামনে থাকলে তো তার উপর এসব নিপীড়ন নির্বিচারে চলে। পক্ষান্তরে যদি সে পালিয়ে যায় তবে নিজের উপরই ঝাল মেটাতে থাকে এবং পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ফেলে, আপন মুখমণ্ডলে আঘাত করে, মাটিতে হাত মারতে থাকে অথবা নেশাখোর মাতালের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। কখনও রাগের কারণে দৌড়াদৌড়ি করার শক্তি থাকে না, ফলে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে থাকে। কখনও জীবজন্তুকে মারতে থাকে এবং গৃহের থালা-বাসন ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়।

অন্তরের উপর ক্রোধের প্রভাব হল, যার উপর ক্রোধ হয়, তার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা হয়, তার অনিষ্ট কামনা করা হয়, তার গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়া হয় এবং তার মানহানির চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয় ঃ ক্রোধের মধ্যবর্তী স্তর। এটা ভাল ও প্রশংসনীয়। এই ক্রোধ জ্ঞান-বুদ্ধির ইশারায় পরিচালিত এবং ধর্মীয় নীতির অনুগত হয়। শরীয়তের আইনানুযায়ী যেখানে ক্রোধ হওয়া ওয়াজিব, সেখানেই এই ক্রোধ প্রকাশ পায়। এরূপ ক্রোধ অবলম্বন করতেই আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন। বলাবাহুল্য, ক্রোধের এই স্তরই নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্তরই উত্তম। এ থেকে জানা গেল, ক্রোধের স্বল্পতা ও বাহুল্য উভয়টি নিন্দনীয় এবং মধ্যবর্তী স্তরটি কাম্য। যার ক্রোধশক্তি এত দুর্বল যে, আত্মসম্মানবোধ বিলুপ্তপ্রায় এবং অন্যায়, জুলুম অসহনীয় নয়। তার উচিত আপন নফসের চিকিৎসা করা, যাতে ক্রোধ শক্তিশালী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত ক্রোধ বিদ্যমান, তারও নফসের চিকিৎসায় ব্রতী হওয়া দরকার, যাতে ক্রোধ উত্তম ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে নেমে আসে। এ পর্যায়কেই বলা হয় "সিরাতে মুস্তাকীম" তথা সরল পথ। এই সরল পথ নিঃসন্দেহে চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম এবং তরবারির চেয়ে তীক্ষ্ণ, কিন্তু যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করে, তার কর্তব্য হচ্ছে, যতদূর সম্ভব এর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ـ

–তোমরা কখনও স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না, যদিও আগ্রহ থাকে। অতএব একজনের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ো না যে, অপরজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে।

সুতরাং এটা জরুরী নয় যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রযত্নে সৎকাজ করতে সক্ষম হয় না, সে সর্বপ্রযত্নে অসৎ কাজই করবে; বরং কতক অনিষ্ট কতকের তুলনায় হাল্কা এবং কতক সৎকাজ কতকের তুলনায় অধিক মর্তবার অধিকারী। অতএব যে বড় সৎকাজ করতে পারে না, সে ছোট সৎকাজ করবে এবং যে অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে না, সে কম ক্ষতিকর অনিষ্ট করেই ক্ষান্ত থাকবে।

সাধনা দ্বারা ক্রোধ দূর হয় কিনা ঃ কিছু লোকের ধারণ, সাধনা দ্বারা ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভবপর। সাধনার উদ্দেশ্যও তা-ই হতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেন, ক্রোধের কোন চিকিৎসাই নেই। এটা তাদের উক্তি, যারা মনে করে অভ্যাসও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুরূপ। বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টিগত ত্রুটি যেমন মানুষ ঠিক করতে পারে না, তেমনি অভ্যাসও চিকিৎসাযোগ্য নয়। এই উভয় উক্তি দুর্বল। এ সম্পর্কে আসল কথা হচ্ছে, মানুষ এক বস্তু ভালবাসে এবং এক বস্তু ঘৃণা করে। এমনিভাবে কতক বস্তু তার মেযাজের অনুকূলে এবং কতক প্রতিকূলে। সুতরাং যে বস্তু তার মেযাজের প্রতিকূলে, তার উপর ক্রোধ না হয়ে পারে না। মনে কর, কেউ তার প্রিয়তম বস্তুটি ছিনিয়ে নিল অথবা কেউ ক্ষতি করতে চাইল; এমতাবস্থায় অবশ্যই ক্রোধ হবে, কিন্তু যে বস্তুকে মানুষ ভালবাসে, তা তিন প্রকার। এক, এমন বস্তু, যা সকলের জন্যে জরুরী; যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য। সুতরাং কেউ যদি তার অন্ন ছিনিয়ে নেয় অথবা বস্ত্র কেড়ে নেয় অথবা বাসগৃহ থেকে বের করে দেয়, তবে তার উপর অবশ্যই ক্রোধ হবে।

দুই, এমন বস্তু, যা কারও জন্যে জরুরী নয়; যেমন অনেক ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, প্রয়োজনের অধিক চাকর-নওকর ইত্যাদি। এসব বস্তু অভ্যাসের কারণে প্রিয়; তবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে দাখিল নয়। কেউ যদি এসব বস্তুর অপচয় করে, তবে তার উপর ক্রোধ হয়। এ ধরনের ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে দূর হতে পারে। উদাহরণতঃ যদি কারও কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি গৃহ থাকে এবং কোন জালেম এসে তা ভূমিসাৎ করে দেয়, তবে এজন্যে ক্রোধ না-ও হতে পারে; যেমন ধর, গৃহস্বামী জ্ঞানীগুণী ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত গৃহের প্রতি তার কোন মহব্বতই নেই। সুতরাং মহব্বত না থাকার কারণে সে ক্রুদ্ধ হবে না, কিন্তু মহব্বত থাকলে অবশ্যই ক্রুদ্ধ হবে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষের ক্রোধ এমন বিষয়ের জন্যে হয়ে থাকে, যা জরুরী নয়। উদাহরণতঃ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট করা, মজলিসে স্বতন্ত্র হয়ে বসতে না দেয়া ইত্যাদি কারণে মানুষ ক্রুদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে যার সভাপতির আসনে বসার শখ নেই, সে জুতার উপর বসলেও ক্রুদ্ধ হয় না।

মোট কথা, অধিকাংশ মানুষ প্রয়োজনীয় মহব্বতের কারণে কথায় কথায় রাগ করে। তারা বুঝে না যে, খাহেশ ও শখ যত বেশী হয়, মানুষের মধ্যে ত্রুটিও তত বেশী হয়। কেননা যার শখ বেশী, তার অভাব বেশী। অভাব পূর্ণতার গুণ নয়– বরং অপূর্ণতার গুণ। মূর্খ ব্যক্তি সর্বদাই চেষ্টা করে যাতে তার অধিকতর অভাব মিটে যায়। অথচ এটাই দুঃখ ও বিষাদের ভাণ্ডার। কেউ কেউ তো মূর্খতার সমুদ্রে এমন নিমজ্জিত থাকে যে, তাদেরকে মন্দ কাজের দোষ বললেও তারা ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ কেউ যদি বলে, তুমি তো ভাল দাবা খেলতে পার না অথবা অনেক মদ পান করতে পার না, তবে তাদের মেযাজ বিগড়ে যায়। অথচ এসব বিষয় মানুষের মধ্যে না থাকাই উত্তম।

তিন, এমন বস্তু, যা কতক মানুষের জন্য জরুরী এবং কতক মানুষের জন্যে জরুরী নয়; যেমন বই-পুস্তক শিক্ষিত ব্যক্তির জন্যে জরুরী। সে বই পুস্তককে মহব্বত করে। কেউ যদি তার বই পুস্তক জ্বালিয়ে অথবা বিনষ্ট করে দেয়, তবে সে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। এমনিভাবে প্রত্যেক পেশাজীবী তার যন্ত্রপাতিকে মহব্বত করে। কেননা এর উপর তার জীবিকা নির্ভরশীল।

এ পর্যন্ত মহব্বতের তিন প্রকার বর্ণিত হল। এখন প্রত্যক প্রকারের মধ্যে সাধনার ফল কি হতে পারে তা দেখা দরকার। প্রথম প্রকারের মধ্যে সাধনা দ্বারা অন্তরের ক্রোধ ষোল আনা বিলুপ্ত করা যায় না। এতে সাধনা এ উদ্দেশে করা হয়, যাতে অন্তর ক্রোধের অনুগত হয়ে না থাকে এবং ক্রোধের ব্যবহার ততটুকুই করে, যতটুকু শরীয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে উত্তম। চেষ্টা সাধনা দ্বারা এই স্তর অর্জন করা সম্ভব। প্রথমে মনের উপর জোর দিয়ে সহ্য করবে এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সহ্য করতে থাকবে। অবশেষে সহ্য করা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। এতে অবশ্য ক্রোধ সমূলে উৎপাটিত হবে না, কিন্তু তার প্রখরতা হ্রাস পাবে এবং দুর্বল হয়ে যাবে। ফলে তার প্রভাব মুখে অনুভূত হবে না। তৃতীয় প্রকার সাধনার অবস্থাও তদ্রূপ। কেননা, এতে কতক লোকের জন্যে তো সেসব

বস্তু জরুরী। সাধনা দ্বারা তাদেরও এই উপকার হবে যে, অন্তরে ক্রোধের তীব্রতা থাকবে না এবং সবরের কষ্ট অধিক অনুভূত হবে না। দ্বিতীয় প্রকার বস্তুর মধ্যে যে ক্রোধ হয়, সাধনা দ্বারা তার মূলোৎপাটন সম্ভবপর। অর্থাৎ জরুরী নয় এমন বস্তুর মহব্বত যখন অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে, তখন সাথে সাথে ক্রোধও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এতে সাধনার পদ্ধতি হচ্ছে, মানুষ এভাবে ধ্যান করবে– আমার দেশ অন্ধকার কবর এবং অবস্থানের জায়গা আখেরাত। দুনিয়া কেবল একটি মধ্যবর্তী পথ। এ পথ অতিক্রম করে যাওয়া সুনিশ্চিত। এখানে আসার উদ্দেশ্য শুধু আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করা। এরপর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ছাড়া সবগুলোকে মনে করবে, আসল বাসস্থান তথা আখেরাতে এসব বস্তু দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। এসব চিন্তা-ভাবনার পর দুনিয়ার মহব্বত অন্তর থেকে মুছে ফেললে নিশ্চিতই আশা করা যায়, ক্রোধ সমূলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিছু না হলে এটা তো অবশ্যই হবে যে, ক্রোধ প্রকাশ করবে না এবং তদনুযায়ী আমল করবে না। কেননা, ক্রোধ মহব্বতের অনুসারী। মহব্বত বিলুপ্ত হয়ে গেলে ক্রোধও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির কাছে কুকুর আছে, যার প্রতি তার মহব্বত নেই। যদি অন্য কোন ব্যক্তি কুকুরটি মেরে ফেলে তবে সে ক্রুদ্ধ হবে না।

মোট কথা, ক্রোধ সমূলে উৎপাটিত হওয়া তো খুবই কঠিন, কিন্তু দুর্বল হয়ে যাওয়া এবং তদনুযায়ী আমল না হওয়া কম সাফল্য নয়। এখানে আপত্তি হতে পারে যে, প্রথম প্রকার অর্থাৎ জরুরী বস্তু বিনষ্ট হয়ে গেলে দুঃখ বেদনা হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে ক্রোধ হওয়া জরুরী নয়। উদাহরণতঃ কেউ একটি ছাগল গোশ্‌ত খাওয়ার উদ্দেশে পালন করল। এখন সেই ছাগলটি মারা গেলে তজ্জন্যে তার দুঃখ অবশ্যই হবে, কিন্তু কারও প্রতি ক্রোধ হবে না। এছাড়া প্রত্যেক দুঃখের সাথে ক্রোধ হওয়া জরুরীও নয়। দেখ, দেহে অস্ত্রোপচার করলে কষ্ট ও ব্যথা তো হয়, কিন্তু যে ডাক্তার অস্ত্রোপচার করে, তার প্রতি ক্রোধ হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তির উপর তওহীদ প্রবল এবং যে সবকিছুকে আল্লাহ তাআলার কুদরতে দাখিল ও তাঁর পক্ষ থেকে বিশ্বাস করে, সে ক্রুদ্ধ হবে না। কারণ, সে মানুষকে লেখকের হাতে কলমের মত নিছক একটি মাধ্যম মনে করবে। বাদশাহ কলম দ্বারা কারও মৃত্যুদণ্ড লেখে দিলে যেমন সে কলমের প্রতি ক্রুদ্ধ হবে না, তেমনি কেউ তার ছাগল যবেহ করে খেয়ে ফেললে সে সেই ব্যক্তির প্রতিও ক্রুদ্ধ হবে না। কেননা, যবেহ ও মৃত্যু সে আল্লাহর পক্ষ থেকেই বিশ্বাস করে। অতএব তওহীদ প্রবল হওয়ার অবস্থায় ক্রোধ না হওয়া

উচিত। এছাড়া আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখার দাবীও তা-ই; অর্থাৎ কেউ যখন ধারণা করবে– আল্লাহ তাআলা আমার জন্যে যা উত্তম তাই করেন, তখন সে বুঝে নেবে, ক্ষুধার্ত থাকা কিংবা রুগ্ন থাকাই সম্ভবতঃ আল্লাহর কাছে আমার জন্যে উত্তম। সুতরাং এক্ষেত্রেও ক্রোধ হওয়ার কোন কারণ নেই। এই আপত্তির জওয়াব হচ্ছে, বাস্তবে তওহীদ প্রবল হলে এটা সম্ভবপর, কিন্তু তওহীদের এই স্তরের প্রবলতা সব সময় থাকে না এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় না; বিদ্যুতের মত আসে এবং চলে যায়। ফলে পরিণামে অন্তরকে ওসিলার উপর ভরসা করতে হয়। যদি তওহীদ দ্বারা এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হত, তবে সৃষ্টির সেরা মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অবশ্যই তা অর্জন করতে পারতেন। অথচ তিনিও ক্রুদ্ধ হতেন; এমন কি, ক্রোধে তাঁর গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ ধারণ করত। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ ইলাহী, আমি মানুষ, মানুষের মত আমারও ক্রোধ হয়। অতএব আমি কোন মুসলমানকে গালি দিয়ে থাকলে অভিসম্পাত করে থাকলে অথবা প্রহার করে থাকলে তুমি আমার পক্ষ থেকে এসব বিষয়কে তার জন্যে রহমত ও নৈকট্যের কারণ করে দাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি যে সমস্ত কথা ক্রোধ ও খুশীর অবস্থায় বলেন, সেগুলো আমি লেখব কি? তিনি বললেন ঃ লেখ। যে আল্লাহ আমাকে সত্য নবী করেছেন তাঁর কসম– এ থেকে অর্থাৎ এ মুখ থেকে সত্য ছাড়া আর কিছু বের হবে না। তিনি এ কথা বলেননি, আমি ক্রুদ্ধ হই না; বরং বলেছেন, ক্রোধ আমাকে সত্যের সীমা অতিক্রম করতে দেয় না; অর্থাৎ আমি ক্রোধের দাবী অনুযায়ী আমল করি না। হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার ক্রুদ্ধ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আয়েশা, তোমার কি হয়েছে? তোমার শয়তান তোমার কাছে এসেছে? হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার শয়তান নেই? তিনি বললেন ঃ কেন থাকবে না, কিন্তু আমার দোয়ায় সে মুসলমান হয়ে গেছে। ফলে সে আমাকে ভাল ছাড়া মন্দ বলে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এখানে একথা বলেননি যে, আমার শয়তান নেই; বরং বলেছেন, সে আমাকে অনিষ্টের আদেশ করে না। এখানে শয়তান বলে ক্রোধ বুঝানো হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও দুনিয়ার জন্যে ক্রোধ প্রদর্শন করতেন না। সত্যের ব্যাপারে ক্রোধ হলে তা কেউ টের পেত না এবং তাঁর ক্রোধের মোকাবিলা করার সাধ্য কারো থাকত

না। এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ক্রোধ যদিও আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য বিষয় ছিল, কিন্তু তাতে মোটামুটিভাবে ওসিলারও দখল ছিল।

হাঁ, মাঝে মাঝে যখন কোন ব্যক্তি কোন অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মশগুল থাকে, তখন প্রয়োজনীয় বস্তু বেহাত হয়ে গেলেও সে ক্রুদ্ধ হয় না। কেননা অন্তর অন্য বিষয়ে মশগুল থাকে। এতে ক্রোধের অবকাশ থাকে না এবং মগ্নতার কারণে অন্য কিছু কল্পনায়ও আনে না। সেমতে হযরত সালমান (রাঃ)-কে যখন কেউ গালি দিল, তখন তিনি বললেন ঃ আমলের দাঁড়িপাল্লায় আমার নেকী কম হলে তুমি যা বলছ, আমি তদপেক্ষাও অধম। আর নেকী ভারী হলে তোমার কথায় আমার কোন ক্ষতি হবে না। এখানে তাঁর অন্তর আখেরাতে মশগুল ছিল বিধায় গালি দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এমনিভাবে রবী ইবনে খায়সামকে কেউ গালি দিলে তিনি বললেন ঃ তোমার কথা আল্লাহ্ শুনেন। জান্নাতের এদিকে একটি উপত্যকা আছে। যদি আমি সেটি অতিক্রম করতে পারি, তবে তোমার কথায় আমার কিছু যায় আসে না। আর যদি অতিক্রম না করতে পারি, তবে তুমি যা বলছ, আমি তার চেয়েও অধম। জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে গালি দিলে তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোর যে সকল দোষ আল্লাহ তাআলা গোপন রেখেছেন, সেগুলো অনেক। তিনি যেন নিজের দোষ-ত্রুটি দেখার মধ্যে মশগুল ছিলেন। জনৈকা মহিলা মালেক ইবনে দীনারকে 'হে রিয়াকার' বললে তিনি রাগ করলেন না। কেননা, তিনি পূর্ব থেকেই নিজেকে রিয়াকার ভাবছিলেন। হযরত শা'বীকে কেউ মন্দ বললে তিনি বললেন ঃ যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ আমার অবস্থার প্রতি রহম করুন, আর তুমি মিথ্যাবাদী হলে তোমার অবস্থার প্রতি রহম করুন। এসব কাহিনী থেকে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয়, এই বুযুর্গগণের ক্রোধ না করার কারণ এটাই ছিল যে, তাঁদের অন্তর ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে মশগুল ছিল। এটাও সম্ভবপর যে, গালি তাদের মনে প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু তাঁরা এদিকে মনোযোগ দেননি। অন্তরে যা প্রবল ছিল, তার প্রতিই তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং ক্রোধ না হওয়ার এ পর্যন্ত দুটি কারণ বর্ণিত হল, অন্তরের অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে মশগুল থাকা এবং তওহীদের বিশ্বাস প্রবল হওয়া। তৃতীয় আর একটি কারণ আছে। তা হচ্ছে, এরূপ বিশ্বাস করা যে, ক্রোধ আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন। এক্ষেত্রে আল্লাহর মহব্বতের কারণে ক্রোধ দমিত হয়ে যাবে। এটাও অসম্ভব নয়। মাঝে মাঝে এরূপ হয়ে

থাকে। আল্লাহ তাআলা আপন কৃপায় আমাদেরকে ক্রোধ দমন করার তওফীক দান করুন। আমীন

ক্রোধের কারণ ও তা দূর হওয়ার উপায় ঃ যেহেতু রোগ ব্যাধি দূর হওয়াও তার কারণ হওয়ার মধ্যে সীমিত। এ কারণে ক্রোধের কারণাদি এবং তা দূর করার উপায়সমূহ জানা উচিত। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, সর্বাধিক কঠোর বস্তু কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর ক্রোধ অত্যন্ত কঠোর। এরপর প্রশ্ন করা হয়, এর কাছাকাছি কঠোর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ মানুষের ক্রোধ। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ ক্রোধ কিসের দ্বারা প্রকাশিত ও লালিত হয়? তিনি বললেন ঃ অহংকার, গর্ব, সম্মান কামনা ও আত্মমর্যাদাবোধ থেকে ক্রোধের উদ্রেক হয়। এ থেকে বুঝা গেল, ক্রোধ তীব্র হওয়ার কারণ এগুলো ঃ অহংকার, আত্মগর্ব, পরিহাস, অনর্থক হাসি-ঠাট্টা, অপরকে দোষারোপ করা, জেদ করা, প্রতারণা করা, অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভ করা ইত্যাদি। শরীয়তে নিন্দনীয় এসব অভ্যাস থাকা অবস্থায় ক্রোধ দূর হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই বিপরীত গুণ দ্বারা এসব দোষ বিদূরিত করা জরুরী; অর্থাৎ বিনয় দ্বারা অহংকার এবং নিজেকে সঠিকভাবে চেনা দ্বারা আত্মপ্রীতি দূর করবে। অহংকার ও আত্মপ্রীতি অধ্যায়ে এ বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত হবে।

গর্বকে এভাবে চিন্তা করে দূর করবে যে, আমিও তো মানুষই। আমার যেসকল বাঁদী গোলাম রয়েছে, সকলেরই আদি পিতা একজনই। পরবর্তীতে বিভিন্ন শ্রেণীগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। আদম সন্তান হওয়ার বেলায় সকলেই সমান। গর্ব উত্তম বিষয়ে করা উচিত। অহংকার, আত্মপ্রীতি ও আস্ফালন তো হীন অভ্যাস। এগুলো নিয়ে কিসের গর্ব? পরিহাস দূর করার উপায় হচ্ছে, এমন ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাপৃত হওয়া, যেন সারাজীবন পরিহাস করার ফুরসতই না পাওয়া যায়। অনর্থক হাসি-ঠাট্টা থেকে বাঁচার জন্যে ইচ্ছাপূর্বক সদগুণাবলীর অন্বেষণে এবং ধর্মীয় বিদ্যা অর্জনে সচেষ্ট হবে, যদ্দ্বারা পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জিত হবে। উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি দোষের প্রতিকারে অনেক সাধনা, ধৈর্য ও পরিশ্রম প্রয়োজন।

মূর্খদের মধ্যে ক্রোধের একটি বড় কারণ হচ্ছে, তারা ক্রোধের নাম রেখেছে বীরত্ব, সাহসিকতা, নির্ভীকতা, শৌর্য ইত্যাদি। ফলে তাদের নফস এদিকে আকৃষ্ট হয়। বুদ্ধির দৈন্যও এ রোগের একটি কারণ। এ কারণেই যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দুর্বল অথবা ত্রুটিযুক্ত, তারা দ্রুত এ রোগে আক্রান্ত হয়। দেখ, সুস্থ ব্যক্তির তুলনায় রুগ্ন ব্যক্তির ক্রোধ তাড়াতাড়ি

হয়। পুরুষের তুলনায় নারীর, প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায় বৃদ্ধের ক্রোধ দ্রুত হয়। শক্তিশালী সে, যে ক্রোধের সময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب ـ

–ভূতলশায়ী করে শক্তিশালী হওয়া যায় না। শক্তিশালী সে-ই, যে ক্রোধের সময় নিজের মালিক থাকে। যার অবস্থা এরূপ নয়, তার সামনে ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীলদের কাহিনী বর্ণনা করা উচিত, যাতে সে নিজের চিকিৎসা করে।

জোশের সময় ক্রোধের প্রতিকার ঃ এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে যে, ক্রোধের কারণসমূহ দূর করা উচিত, যাতে ক্রোধ তীব্র আকার ধারণ না করে। এখন বর্ণনা করা হচ্ছে, যদি কোন কারণে ক্রোধ তীব্র হয়ে যায়, তবে এমন দৃঢ়তা অবলম্বন করা দরকার যেন ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অস্থির হয়ে তদনুযায়ী অশালীন পন্থায় কাজ না করে বসে। এলেম ও আমলের প্রতিষেধক দ্বারা এই দৃঢ়তা অর্জিত হয়। এলেম সম্পর্কিত বিষয় ছয়টি। (১) ক্রোধ হজম ও সহনশীল হওয়ার ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করে সওয়াব লাভের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। এতে আশ্চর্য নয় যে, সওয়াবের লোভে ক্রোধের তীব্রতা দূর হয়ে যাবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকবে। হযরত মালেক ইবনে আউস বলেন ঃ একবার হযরত ওমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে প্রহার করার আদেশ দেন। তখন আমি এ আয়াত পাঠ করলাম ঃ

خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجهلين ـ

'ক্ষমা কর, সৎকাজের আদেশ কর এবং মূর্খদের থেকে বিরত থাক।'

হযরত ওমর (রাঃ) আয়াতটি বার বার পাঠ করছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, কোন আয়াত তাঁর সামনে পাঠ করা হলে তিনি অনেকক্ষণ তার মর্ম বুঝার জন্যে চিন্তা ভাবনা করতেন। তদনুযায়ী চিন্তা করে তিনি লোকটিকে মুক্ত করে দিলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) এক ব্যক্তিকে প্রহার করার আদেশ দেয়ার পর নিজেই এই আয়াত পাঠ করতে লাগলেন ঃ

والكظمين الغيظ والعافين عن الناس ـ

–ক্রোধ হজমকারী ও মানুষকে মার্জনাকারী।

এরপর অবিলম্বে লোকটিকে মার্জনা করে দিলেন।

(২) নিজেকে আল্লাহর আযাব থেকে সতর্ক করবে এবং এভাবে চিন্তা করবে– এ ব্যক্তির উপর আমার যে ক্ষমতা, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলার আমার উপর রয়েছে। আজ তার উপর যদি আমি ক্রোধ কার্যকর করি, তবে কাল কেয়ামতে আল্লাহর ক্রোধ থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তখন আমারও ক্ষমার প্রয়োজন হবে। সুতরাং অপরকে ক্ষমা করলে সম্ভবতঃ আমি ক্ষমা পেয়ে যাব। এক সহীফায় আল্লাহ তাআলার এই উক্তি বর্ণিত আছে– হে আদম সন্তান! তোমার ক্রোধের সময় আমাকে স্মরণ কর, আমার ক্রোধের সময় আমি তোমাকে স্মরণ করব। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক খাদেমকে কাজের জন্যে প্রেরণ করেন। সে অনেক বিলম্ব করে ফিরে আসে। তিনি বললেন ঃ

لَوْلَا الْقِصَاصُ لَاَوْجَعْتُكَ অর্থাৎ, কেয়ামতের প্রতিশোধ না থাকলে আমি তোমাকে যন্ত্রণা দিতাম।

কথিত আছে, বনী ইসরাঈলের প্রত্যেক বাদশাহর সাথে একজন করে পণ্ডিত ব্যক্তি থাকত। বাদশাহ যখন ক্রুদ্ধ হত, তখন পণ্ডিত ব্যক্তি তার হাতে একটি চিরকুট দিত। তাতে লেখা থাকত ঃ মিসকীনের প্রতি সদয় হও, মৃত্যুকে ভয় কর এবং কেয়ামতের কথা স্মরণ কর। চিরকুট দেখেই বাদশাহের ক্রোধ দমিত হয়ে যেত।

(৩) যদি পরকালীন আযাবের ভয় না থাকে, তবে ক্রোধের কারণে উদ্ভূত ইহকালীন দুঃখ বিপদাপদের কথাই চিন্তা করবে। অর্থাৎ এভাবে ভাববে– যার প্রতি ক্রুদ্ধ হব, সে আমার শত্রু হয়ে যাবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নাশকতা, নিপীড়ন ও মানহানি করতে সচেষ্ট হবে। এ চিন্তার সারমর্ম হচ্ছে, দুনিয়ার একটি অনিষ্ট অন্য একটি অনিষ্টের চিন্তা দ্বারা হটিয়ে দেয়া। তাই এটা আখেরাতের আমলের মধ্যে গণ্য হবে না এবং এজন্যে সওয়াবও পাওয়া যাবে না।

(৪) ক্রোধের সময় অন্য লোকের চেহারা যেমন বীভৎস হয়ে যায়, নিজের চেহারাকে ক্রোধের বেলায় সেরূপ কল্পনা করবে এবং ধ্যান করবে, ক্রোধের কারণে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির চেহারা ও আকার-আকৃতি ক্ষেপা কুকুর অথবা হিংস্র প্রাণীর মত হয়ে যায়। এর বিপরীতে সহনশীল, গম্ভীর ও ক্রোধ বর্জনকারী ব্যক্তির চেহারা পয়গম্বর, ওলী, আলেম ও দার্শনিকের চেহারার মত থাকে। এখন কোন্ চেহারা সে অবলম্বন করবে, তা নিজেই বেছে নেবে। বুদ্ধিমান হলে মহাপুরুষদের চেহারাই বেছে নিতে বাধ্য হবে।

(৫) যে কারণে প্রতিশোধ নিতে চায় এবং ক্রোধ হজম করতে পারে না, সেই কারণ সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, সেটা কি? উদাহরণতঃ শয়তান প্ররোচনা দেয়, তুমি প্রতিশোধ না নিলে প্রতিপক্ষ তোমাকে দুর্বল মনে করবে এবং মানুষের কাছেও তুমি লাঞ্ছিত অপমানিত হবে। যদি কারণ এটাই হয়, তবে আপন নফসকে বুঝাবে– আশ্চর্যের বিষয়, সহনশীলতা তোমার কাছে মন্দ মনে হয়। অপরপক্ষে মানুষের দৃষ্টিতে হেয় হওয়ার খুব আশংকা কর, কিন্তু আল্লাহ, ফেরেশতা ও পয়গম্বরগণের দৃষ্টিতে হেয় হওয়ার ভয় মোটেই কর না। আল্লাহর ওয়াস্তে ক্রোধ হজম করে ফেললেই মর্তবা বেশী হবে।

(৬) একথা ভাববে যে, আমার ক্রোধের কারণ হচ্ছে আমার মর্জি অনুযায়ী কাজ না হওয়া। বলাবাহুল্য, আল্লাহর মর্জির উপর নিজের মর্জিকে অগ্রাধিকার দেয়া নেহায়েত নির্বুদ্ধিতা। সম্ভবতঃ এ কারণে আমার উপর আল্লাহর ক্রোধ আমার ক্রোধের চেয়েও বেশী হবে।

ক্রোধের আমল সম্পর্কিত প্রতিষেধক হচ্ছে, মুখে বলবে–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ –আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

–ক্রোধের সময় এটাই বলার আদেশ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন ক্রুদ্ধ হতেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর নাক ধরে বলতেন– হে আয়েশা বল ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اِغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ ـ

–হে আল্লাহ, পয়গম্বর মুহাম্মদের পালনকর্তা, আমার গোনাহ মাফ কর, আমার মনের ক্রোধ দূর কর এবং আমাকে বিভ্রান্তকারী ফেতনা থেকে আশ্রয় দাও।

অতএব এ দোয়াটি বলাও মোস্তাহাব। যদি এই দোয়ায় ক্রোধ দূর না হয়, তবে দাঁড়িয়ে থাকলে বসে যাবে এবং বসা থাকলে শুয়ে পড়বে। উদ্দেশ্য, নিজেকে মাটির নিকটবর্তী করে দেবে– যাতে জানতে পার যে, তুমি এই মাটি দ্বারা সৃজিত এবং পরিণামে এই মাটিতেই যেতে হবে। এই আমলের বদৌলতে নফসের হীনতা বোধগম্য হয়ে যাবে। কেননা ক্রোধ উত্তাপের কারণে হয় এবং উত্তাপ গতিশীলতার কারণে। বসা অথবা শয়ন দ্বারা যখন গতিশীলতা দূর হয়ে যাবে, তখন আশা করা যায়,

ক্রোধও দূর হয়ে যাবে। এ আমলটিও হাদীসে বর্ণিত আছে। বলা হয়েছে–

اِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تُوْقَدُ فِي الْقَلْبِ اَلَمْ تَرَوْا اِلٰى اِنْتِفَاخِ اَوْدَاجِهِ وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ فَاِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ مِّنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَاِنْ كَانَ جَالِسًا فَلْيَقُمْ ـ

–ক্রোধ একটি স্ফুলিঙ্গ, যা অন্তরে প্রজ্বলিত হয়। তোমরা দেখ না, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে যায়, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে যায়? তোমাদের কেউ যদি নিজের মধ্যে এ অবস্থা দেখে, তবে দাঁড়িয়ে থাকলে যেন বসে পড়ে এবং বসা থাকলে যেন শুয়ে পড়ে।

যদি এরপরও ক্রোধ দূর না হয়, তবে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ওযু অথবা গোসল করে নেবে। কারণ, পানি ছাড়া অগ্নি নির্বাপিত হয় না।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ بِالْمَاءِ فَاِنَّمَا الْغَضَبُ مِنَ النَّارِ

–যখন তোমাদের কেউ ক্রুদ্ধ হয়, তখন যেন পানি দিয়ে ওযু করে। কারণ ক্রোধ অগ্নি থেকে উৎপন্ন।

অন্য এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ

–নিশ্চয় ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে, শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃজিত আর পানি দ্বারা অগ্নি নিভে যায়। অতএব তোমাদের কেউ ক্রুদ্ধ হলে সে যেন ওযু করে।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে–

اَلَا اِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِيْ قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ اَلَا تَرَوْنَ اِلٰى جَمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ اَوْدَاجِهِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَلْيُلْصِقْ خَدَّهٗ بِالْاَرْضِ ـ

–সাবধান, ক্রোধ একটি স্ফুলিঙ্গ, যা আদম সন্তানের অন্তরে থাকে। দেখ না, তার চক্ষুদ্বয়ের রক্তিম বর্ণ এবং ঘাড়ের শিরাসমূহের স্ফীতি? যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এ অবস্থা দেখে, সে যেন আপন গণ্ডদেশকে মাটির সাথে মিলিয়ে দেয়।

এ হাদীসে সেজদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ দেহের সেরা

অঙ্গটি সর্বাধিক নিকৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ মাটিতে রাখা উচিত, যাতে নফস তার হীনতা বুঝতে পেরে ক্রোধের কারণ অহংকার থেকে বিরত থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে নাকে পানি দিতে শুরু করেন এবং বলেন ঃ ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে হয় এবং এই আমল দ্বারা শয়তান দূর হয়ে যায়। ওরওয়া ইবনে মুহাম্মদ বলেন ঃ আমি যখন মাদইয়ানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলাম, তখন আমার পিতা আমাকে বললেন ঃ তুমি শাসনকর্তা হয়েছ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ যখন তোমার ক্রোধ হয় তখন আকাশ ও পৃথিবীকে দেখে এদের স্রষ্টার মাহাত্ম্য স্বীকার করবে, অর্থাৎ সেজদা করবে।

ক্রোধ হজম করার ফযীলত ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রশংসার স্থানে এরশাদ করেন وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ এবং যারা ক্রোধকে হজম করে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللّٰهُ عَذَابَهُ وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلٰى رَبِّهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهُ وَمَنْ خَذَلَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ ـ

–যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে বাধা দেয়, আল্লাহ তার আযাবকে বাধা দেবেন। যে তার পালনকর্তার কাছে ওযর পেশ করে, আল্লাহ তার ওযর কবুল করেন। যে তার জিহ্বাকে সংযত রাখে, আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখেন। তিনি আরও বলেন ঃ

اَشَدُّكُمْ مَنْ غَلَبَهُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَاَحْلَمُكُمْ مَنْ عَفَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ ـ

–তোমাদের মধ্যে দৃঢ়চেতা সে ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় আপন নফসের উপর প্রবল হয় এবং তোমাদের মধ্যে অধিক সহনশীল সে ব্যক্তি, যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাফ করে।

আরও বলা হয়েছে–

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ اَنْ يُمْضِيَهُ اَمْضَاهُ مَلَأَ اللّٰهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

–যে ব্যক্তি এমন সময়ে ক্রোধ দমন করে যে, ইচ্ছা করলে তা অব্যাহত রাখতে পারে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন আপন সন্তুষ্টি দ্বারা তার অন্তর পূর্ণ করে দেবেন।

এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে–

مَا جَرَعَ عَبْدٌ جَرْعَةً اَعْظَمَ اَجْرًا مِنْ جَرْعَةٍ كَظَمَهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

–আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ক্রোধ গিলে ফেলার সমান সওয়াব কোন কিছুর মধ্যে নেই, যা বান্দা গলাধঃকরণ করে।

আইউব (রহঃ) বলেন ঃ এক মুহূর্ত সহ্য করা অনেক অনিষ্ট দূর করে দেয়। একবার হযরত সুফিয়ান সওরী, আবু খুযায়মা ও ফোযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) এক জায়গায় একত্রিত হন এবং সংসার নির্লিপ্ততা সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন অবশেষে সকলেই এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছেন যে, সর্বোত্তম আমল হচ্ছে ক্রোধের সময় সহ্য করা এবং লোভের সময় ধৈর্য ধারণ করা।

এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-কে বলল ঃ আপনি ইনসাফ সহকারে বিচার করেন না এবং বেশী দান করেন না। এতে তিনি এত ক্রুদ্ধ হলেন যে, মুখমন্ডলে তার প্রভাব ফুটে উঠল। তখন এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ আমীরুল মুমেনীন, আপনি কি করতে চান? এ ব্যক্তি মূর্খ, যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ –ক্ষমা অবলম্বন কর, সৎকাজের আদেশ কর এবং মূর্খদের থেকে বিরত থাক।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছ। এরপর যেন একটি অগ্নি দফ করে নিভে গেল।

মুহাম্মদ ইবনে কাব বলেন ঃ তিনটি বিষয় কারও মধ্যে একত্রিত হলে তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। এক, যখন খুশীর অবস্থায় থাকে, তখন যেন বাতিল বিষয়াদিতে প্রবেশ না করে। দুই, যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন যেন সত্যের সীমা ডিঙ্গিয়ে না যায়। তিন, যখন ক্ষমতা থাকে, তখন যে বস্তু নিজের নয়, তা যেন না নেয়।

সহনশীলতার ফযীলত ঃ ক্রোধেরই একটি বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় সহনশীলতা। তা হচ্ছে ক্রোধের মধ্যে স্ফুটন না হওয়া; যদি হয়ও তবে দমন করতে কষ্ট না হওয়া। এ অবস্থা ক্রোধ হজম করার চেয়ে উত্তম। কেননা, ক্রোধ হজম করার মানে হচ্ছে জোরে জবরে সহনশীল হওয়া। সুতরাং এটা বানোয়াট। আর সহনশীলতা বলা হয় একটি মজ্জাগত স্বভাবকে, যদ্দারা বুদ্ধির পূর্ণতা প্রমাণিত হয় এবং ক্রোধশক্তি

অনুগত ও পরাভূত থাকে, কিন্তু শুরুতে জোরে-জবরে সহনশীল হওয়ার মাধ্যমে এ স্বভাবটি অর্জিত হয়।

সেমতে হাদীসে বলা হয়েছে-

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ وَمَنْ يَتَخَيَّرِ الْخَيْرَ يُعْطَهُ وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ .

-এলেম আসে শিক্ষার মাধ্যমে এবং সহনশীলতা আসে জোরে-জবরে সহনশীল হওয়ার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি কল্যাণের ইচ্ছা করে, তা প্রাপ্ত হয় এবং যে অনিষ্ট থেকে বাঁচে সে নিরাপদ থাকে।

এ থেকে জানা গেল, সহনশীলতা অর্জনের উপায় হচ্ছে প্রথমে জোরে-জবরে সহনশীল হওয়া; যেমন এলেম অর্জন করার ওসিলা হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণ করা। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়াতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَاطْلُبُوا مَعَ الْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْحِلْمَ وَلِينُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَ وَلِمَنْ تَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ وَلَا تَكُونُوا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ فَيَغْلِبَ جَهْلُكُمْ عَلَى عِلْمِكُمْ .

এলেম অন্বেষণ কর এবং এলেমের সাথে গাম্ভীর্য ও সহশীলতা অন্বেষণ কর। তোমরা নম্র হও তার জন্যে, যাকে শেখাও এবং যার কাছ থেকে শেখ। স্বেচ্ছাচারী আলেম হয়ো না। তাহলে তোমাদের মূর্খতা এলেমের উপর প্রবল হয়ে যাবে।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্রোধে উত্তেজিত হওয়ার কারণ হচ্ছে অহংকার ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং এটাই নম্রতা ও সহনশীলতার অন্তরায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে দোয়া করতেন-

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِيْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّيْ بِالْحِلْمِ وَاَكْرِمْنِيْ بِالتَّقْوٰى وَجَمِّلْنِيْ بِالْعَافِيَةِ .

-হে আল্লাহ, আমাকে এলেম দ্বারা ধনী কর, সহনশীলতা দ্বারা সজ্জিত কর, তাকওয়া দ্বারা সম্মানিত কর এবং সুস্থতা দ্বারা সুন্দর কর।

এক হাদীসে বলা হয়েছে-

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْحَلِيْمَ الرحى الْغَنِيَّ الْمُتَعَفِّفَ التَّقِيَّ وَيُبْغِضُ

الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ .

-আল্লাহ তা'আলা পছন্দ কলেন সহনশীল, লজ্জাশীল, ধনী, পবিত্র মুত্তাকীকে এবং ঘৃণা করেন নির্লজ্জ, বকবককারী নাছোড়বান্দা হয়ে সওয়ালকারীকে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে একত্রীত করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে- গুণী ব্যক্তিরা কোথায়? এতে অল্প সংখ্যক লোক দাঁড়াবে এবং জান্নাতের দিকে দৌড় দেবে। ফেরেশতা তাদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করবে- তোমরা দৌড়ে যাচ্ছ? তারা বলবে হাঁ, আমরা গুণীজন। ফেরেশতারা শুধাবে- তোমাদের মধ্যে কি গুণ ছিল? তারা জওয়াব দেবে, আমাদের উপর জুলুম করা হলে আমরা সবর করতাম। কেউ আমাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করলে আমরা ক্ষমা করে দিতাম। কেউ মূর্খতা করলে আমরা সহনশীলতা প্রদর্শন করতাম। ফেরেশতা বলবে ঃ তা হলে এখন জান্নাতে চলে যাও।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ অর্থ সম্পদ বেড়ে যাবে এবং সন্তান সন্ততি অনেক হবে বরকত এর নাম নয়। বরকত হচ্ছে এলেম ও সহনশীলতা অধিক হওয়া। আকসাম ইবনে সায়ফী বলেন ঃ বুদ্ধির স্তম্ভ হচ্ছে সহনশীলতা এবং সব কথার মূল হচ্ছে সবর। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ সহনশীল ব্যক্তি সহনশীলতার কারণে প্রথম পুরস্কার এটাই পায় যে, সকল মানুষ তার সপক্ষে থেকে তার অনিষ্টকারীর পেছনে লাগে। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) আমর ইবনে আসামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বীরপুরুষ কে? তিনি বললেন ঃ যে আপন সহনশীলতা দ্বারা মূর্খতাকে হটিয়ে দেয়। আবার প্রশ্ন হল ঃ দানবীর কে? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ যে দুনিয়াতে দ্বীনের কল্যাণার্থে অর্থ সম্পদ ব্যয় করে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন -

فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ .

-অতঃপর তুমি দেখবে, তোমার মধ্যে ও যার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এটা তারাই পায়, যারা সবর করে এবং এটা সে-ই লাভ করে, যে মহাভাগ্যবান।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ

এখানে সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যাকে তার কোন ভাই গালি দিলে সে প্রত্যুত্তরে বলে- তুমি মিথ্যাবাদী হলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, আর তুমি সত্যাবাদী হলে আল্লাহ্ আমাকে মার্জনা করুন। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) একবার এরাবা ইবনে আউস আনসারীকে প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে সরদার হলে কিরূপে? তিনি বললেন ঃ তাদের মধ্যে যারা মূর্খ, আমি তাদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করি। আর যারা সওয়াল করে, তাদেরকে দান করি এবং অভাব মোচনে চেষ্টা করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার মত কাজ করবে, সে আমার মত হবে, যে আমার চেয়ে বেশী কাজ করবে, সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। আর যদি কম কাজ করে তবে আমি তার চেয়ে উত্তম হব। এক ব্যক্তি ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমারও কিছু লোকের মধ্যে বিবাদ আছে । আমার ইচ্ছা বিবাদ মিটিয়ে ফেলি, কিন্তু লোকে বলে, এতে যিল্লতী আছে। ইমাম জাফর সাদেক বললেন ঃ যিল্লতী জালেমেরই হয়। তোমার কোন যিল্লতী নেই।

প্রতিশোধের জন্য যে পরিমাণ কথা বলা দুরস্ত ঃ জুলুমের বদলে জুলুম করা এবং অন্যায়ের মোকাবিলায় অন্যায় করা তো সম্পূর্ণ নাজায়েয। উদাহরণতঃ গীবতের বিনিময়ে গীবত করা এবং গালির জওয়াবে গালি দেয়া জায়েয নয়। হাঁ, প্রতিশোধের নিমিত্ত শরীয়তে যতটুকু করা বর্ণিত আছে, সে পরিমাণই জায়েয। গালির বদলে গালি দেয়া কিছুতেই উচিত নয়। কেননা, হাদীসে আছে–

اِنِ امْرِؤٌ عَيَّرَكَ بِمَا فِيْكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا فِيْهِ اَلْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ -

–যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে তোমার বাস্তব দোষ ধরে লজ্জা দেয়, তবে তুমি তাকে তার দোষ ধরে লজ্জা দিয়ো না। যারা একে অপরকে গালি দেয়, তারা উভয়েই শয়তান। তারা পরস্পরে মিথ্যা বলে।

এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে গালি দিল। তিনি চুপচাপ শুনলেন। এরপর যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে কিছু বলা শুরু করলেন, তখনই রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্থানোদ্যত হলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, যখন লোকটি আমাকে মন্দ বলছিল, তখন আপনি নির্বিকার রইলেন। এখন আমি প্রতিশোধ নিতে চাইলে আপনি প্রস্থানোদ্যত হলেন। এর কারণ কি? রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ যতক্ষণ তুমি চুপ ছিলে.

ফেরেশতারা তোমার পক্ষ থেকে জওয়াব দিচ্ছিল, যখনই তুমি মুখ খুললে ফেরেশতা চলে গেল এবং শয়তান আগমন করল। যে মজলিসে শয়তান থাকে, আমি সেখানে থাকতে চাই না।

কেউ কেউ বলেন, মোকাবিলায় এমন কথা বলা জায়েয, যাতে মিথ্যা নেই। হাদীসে সাবধানতার কারণে নিষেধ করা হয়েছে; অর্থাৎ এমন কথাও বর্জন করা উত্তম, কিন্তু বললে গোনাহগার হবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এরূপ বলা ঃ তুমি কে? তুমি অমুকের সন্তান না? যেমন সা'দ (রাঃ) হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ তুমি কি বনী হুযায়লেরই একজন না? জওয়াবে ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেছিলেন ঃ তুমি কি বনী উমাইয়ারই একজন না? অথবা কাউকে নির্বোধ বলাও জায়েয। কেননা, মুতরিফ (রঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী সকল মানুষই আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে নির্বোধ। তবে কেউ কম এবং কেউ বেশী। হাদীস শরীফে এরূপই বর্ণিত আছে। অনুরূপভাবে কাউকে মূর্খ বলে দেয়াও জায়েয। কেননা, কোন না কোন প্রকার মূর্খতা সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। মোট কথা, এ ধরনের কথা দ্বারা মানুষ কষ্ট অনুভব করে ঠিক, কিন্তু তা মিথ্যা হয় না। তবে চোগলখোরী, গীবত ও পিতামাতাকে গালি দেয়া সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

যে কথা মিথ্যা নয়, তা প্রতিশোধ গ্রহণার্থে বলা জায়েয। এ বিষয়ের প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন- একবার পত্নীগণ সকলে মিলে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে প্রেরণ করলেন। তিনি এসে পিতার কাছে আরজ করলেন ঃ আপনার পত্নীগণ আমাকে এই উদ্দেশে পাঠিয়েছেন যে, আপনি আয়েশাকেও তাদের সমান মনে করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শায়িত ছিলেন।

তিনি বললেন ঃ ফাতেমা! আমি যাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাসবে? তিনি আরজ করলেন ঃ অবশ্যই। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ তাহলে তুমি আয়েশাকে ভালবাস। হযরত ফাতেমা (রাঃ) ফিরে গিয়ে পত্নীদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাঁরা বললেন ঃ তুমি তো কিছুই করতে পারলে না। খালি হাতেই ফিরে এসেছ। অতঃপর তাঁরা যয়নব বিনতে জাহাশকে পাঠালেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ যয়নব আমার সমান মহব্বত দাবী করতেন। তিনি এসে বলতে শুরু করলেন ঃ আবু বকরের কন্যা এমন, আবু বকরের কন্যা অমন; এভাবে তিনি আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে গেলেন। আমি চুপচাপ শুনলাম; কিন্তু অপেক্ষা করছিলাম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে অনুমতি দিন। তিনি যখন

আমাকে অনুমতি দিলেন, তখন আমি এত বললাম যে, বলতে বলতে মুখ শুকিয়ে গেল। তখন রসূলে করীম (সাঃ) হযরত যয়নবকে বললেন ঃ আবু বকরের কন্যাকে দেখলে? তার মোকাবিলা করার সাধ্য তোমার নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) যয়নব (রাঃ)-কে যে সকল কথা বলেছিলেন, তাতে অশ্লীলতা ছিল না– কেবল তাঁর কথার ঠিক ঠিক জওয়াব ছিল। এক হাদীসে আছে–

اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْمُبَادِي مِنْهُمَا حَتّٰى يَعْتَدِي الْمَظْلُوْمُ.

–দুগালিগালাজকারী যা কিছু বলে তা যে শুরু করে, তার উপর বর্তায়, যে পর্যন্ত মজলুম সীমালঙ্ঘন না করে।

এ থেকে জানা গেল, মজলুম প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রাখে, যদি সীমালঙ্ঘন না করে।

সুতরাং পূর্ববর্তীগণ যে প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন তা যে পরিমাণ কষ্ট হয়, সেই পরিমাণ শোধ নেয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু এটাও বর্জন করা উত্তম। কেননা, এতে বাড়াবাড়ি হওয়ার আশংকা থাকে এবং ওয়াজিব পরিমাণ শোধ নিয়েই ক্ষান্ত হওয়া যায় না।

এখন জানা দরকার, কতক মানুষ ক্রোধের তীব্রতায় আত্মসংবরণ করতে পারে না। আবার কেউ কেউ শুরুতে ক্রোধ করে নেয়; কিন্তু চিরকালের জন্যে অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতে থাকে। এ দিক দিয়ে মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত। এক, যারা ঘাসের ন্যায় দ্রুত জ্বলে উঠে এবং দ্রুত নিভে যায়। দুই, যারা পাথরের কয়লার মত বিলম্বে প্রজ্বলিত হয় এবং বিলম্বেই নেভে। তিন, যারা ভেজা লাকড়ির মত বিলম্বে জ্বলে কিন্তু দ্রুত নিভে যায়। এ অবস্থা খুব ভাল, যদি নম্রতা অসম্মান না হয়। চার, যারা দ্রুত জ্বলে উঠে এবং বিলম্বে নির্বাপিত হয়। এটা সবগুলোর মধ্যে মন্দ। হাদীসে বলা হয়েছে– ঈমানদার দ্রুত ক্রুদ্ধ হয় এবং দ্রুত শান্ত হয়ে যায়। এভাবে অভ্যাসের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ যাকে ক্রোধের কথা বললেও ক্রুদ্ধ হয় না, সে গাধা। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ বিভিন্ন প্রকার। কতক বিলম্বে ক্রুদ্ধ হয় এবং দ্রুত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। কতক দ্রুত ক্রুদ্ধ হয় এবং দ্রুত ক্রোধ ফানা হয়ে যায়। এক বিষয়ের ক্ষতি অন্য বিষয় দ্বারা পূরণ হয়ে যায়। আবার কতক লোক দ্রুত ক্রুদ্ধ হয় এবং বিলম্বে ক্রোধ ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু সকলের মধ্যে

উত্তম সে, যার ক্রোধ হয় বিলম্বে এবং থেমে যায় দ্রুত। পক্ষান্তরে সকলের মধ্যে মন্দ সে-ই, যার ক্রোধ হয় দ্রুত এবং থামে অনেক বিলম্বে। ক্রোধের তীব্রতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে বিধায় যারা শাসক, তাদের জন্যে ক্রুদ্ধ অবস্থায় কাউকে সাজা না দেয়া জরুরী; নতুবা সাজা ওয়াজিব পরিমাণের বেশী হয়ে যাওয়া অবান্তর নয়। এ কারণেই সাজা কেবল আল্লাহর কাছে অপরাধের কারণে দেবে– আপন স্বার্থের জন্যে দেবে না। সেমতে হযরত ওমর (রাঃ) একবার এক মাতালকে দেখে শাস্তি দিতে চাইলেন। ইত্যবসরে মাতাল তাকে গালি দিল। তিনি ফিরে এলেন। লোকেরা আরজ করল ঃ গালি দেয়ার কারণে আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন কেন? তিনি বললেন ঃ তার গালির কারণে আমার রাগ ধরেছিল। এমতাবস্থায় তাকে প্রহার করলে তাতে আমার নিজের ক্রোধেরও সম্পর্ক থাকত। অথচ আমি চাই যেন আমার নিজের জেদের কারণে কোন মুসলমানকে প্রহার না করি।

বিদ্বেষের অর্থ ও তার ফল ঃ যখন মানুষ ক্রোধের প্রতিশোধ নিতে অসমর্থ হয়, তখন ক্রোধ হজম করে নিতে হয়, ফলে তা অন্তরে পতিত হয়ে বিদ্বেষ হয়ে যায়। বিদ্বেষের অর্থ হচ্ছে কাউকে অসহ্য মনে করা এবং তার প্রতি অন্তরে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করা। এটা নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ اَلْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحَقُوْدٍ –মুমিন বিদ্বেষপরায়ণ নয়। বিদ্বেষ ক্রোধের ফল এবং এ থেকে আটটি বিষয় উৎপন্ন হয়।

প্রথম, হিংসা অর্থাৎ অপরের কাছ থেকে নেয়ামতের অবসান কামনা করা, তার নেয়ামতপ্রাপ্তিতে দুঃখিত হওয়া এবং তার বিপদে পতিত হওয়ায় আনন্দ করা।

দ্বিতীয়, অন্তরে হিংসা এমন বেড়ে যাওয়া যে, অপরের বিপদে শত্রুর ন্যায় হাসতে প্রস্তুত থাকা।

তৃতীয়, অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, যদিও সে সম্পর্ক বজায় রাখতে ও কাছে আসতে চায়।

চতুর্থ, অপরকে নিকৃষ্ট ও হেয় মনে করা।

পঞ্চম, তার সম্পর্কে অবৈধ কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করা; যেমন গীবত করা, মিথ্যা বলা, গোপন তথ্য ফাঁস করা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ, কথাবার্তায় তার সাথে কৌতুক ও পরিহাস করা।

সপ্তম, তাকে প্রহার করে দৈহিক কষ্ট দেয়া।

অষ্টম, তার কিছু প্রাপ্য থাকলে তা শোধ না করা। এ আটটি বিষয়ই হারাম। বিদ্বেষের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে উপরোক্ত আটটি বিষয় থেকে বেঁচে

থাকা এবং কেবল অন্তরে অপরকে মন্দ জানা; এমনকি পূর্বে তার সাথে যা যা করত, তা না করা; যেমন তাকে দেখে খুশী না হওয়া, নম্রতা ও দান খয়রাত না করা, তার অভাব মোচনে সাহায্য না করা ইত্যাদি। এসব বিষয়ের কারণে দ্বীনদারীতে মানুষের মর্তবা হ্রাস পায়, যদিও সে শাস্তির যোগ্য হয় না। দেখ, হযরত আবু বকর (রাঃ) মেসতাহকে কিছু দেবেন না বলে কসম খেয়েছিলেন। মেসতাহ্ ছিলেন তাঁর আত্মীয়, কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপে তাঁরও কিছু ভূমিকা ছিল। এ সম্পর্কে কোরআন পাকে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ـ

–তোমারদের মধ্যে যারা গুণী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল, তারা যেন আত্মীয়, মিসকীন ও মুহাজিরদেরকে দান করার ব্যাপারে কসম না খায়। তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন।

এই আয়াত নাযিল হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন ঃ হাঁ, আমরা আল্লাহর মাগফেরাত পছন্দ করি। এরপর পূর্বে যা দিতেন, তা পুনর্বহাল করে দিলেন। এ থেকে জানা গেল, পূর্ববৎ ব্যবহার অব্যাহত রাখাই উত্তম। যদি মনের উপর জোর দিয়ে শয়তানের বিরুদ্ধাচরণহেতু কিছু বেশী দান করে, তবে এটা সিদ্দীকগণের স্তর।

ক্ষমার ফযীলত ঃ ক্ষমার অর্থ হচ্ছে অপরের কাছে যা প্রাপ্য থাকে, তা ছেড়ে দেয়া; যেমন কেসাস ও কর্জ ইত্যাদি কারও যিম্মায় থাকলে তা থেকে তাকে মুক্ত করে দেয়া। এর অনেক প্রশংসা বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ـ

ক্ষমা কর, সৎকাজের আদেশ কর এবং মুর্খদের থেকে বিরত থাক।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى –আর ক্ষমা করা খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ তিনটি বিষয় আমি কসম খেয়ে বলতে পারি - এক, দান খয়রাত দ্বারা ধন-সম্পদ হ্রাস পায় না। দান খয়রাত করা উচিত। দুই, যদি কোন ব্যক্তি নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে আপন প্রাপ্য ছেড়ে দেয়, তবে

আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার সম্মান বৃদ্ধি করবেন। তিন, যে ব্যক্তি নিজের সামনে সওয়ালের দরজা উন্মোচন করে, আল্লাহ তাআলা তার সামনে দারিদ্র্যের দরজা প্রশস্ত করে দেন। এক হাদীসে আছে-

اَلتَّوَاضُعُ لَا يَزِيْدُ الْعَبْدَ إِلَّا رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوْا يَرْفَعْكُمُ اللّٰهُ وَالْعَفْوُ لَا يَزِيْدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزًّا فَاعْفُوْا يُعِزَّكُمُ اللّٰهُ وَالصَّدَقَةُ لَا يَزِيْدُ الْعَبْدَ إِلَّا كَثْرَةً فَتَصَدَّقُوْا يَرْحَمْكُمُ اللّٰهُ ـ

–বিনয় বান্দার কেবল উচ্চতাই বৃদ্ধি করে। অতএব তোমরা বিনয় প্রদর্শন কর। আল্লাহ তোমাদেরকে উচ্চতা দেবেন। ক্ষমা বান্দার কেবল সম্মানই বৃদ্ধি করে। অতএব তোমরা ক্ষমা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে সম্মান দেবেন। দান-খয়রাত কেবল প্রাচুর্যই বাড়ায়। অতএব তোমরা দান খয়রাত কর। আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করবেন।

হযরত ওকবা (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। এরপর সঠিক বলতে পারব না, আমি প্রথমে তাঁর হাত ধরলাম না তিনি আমার হাত ধরলেন। তিনি বললেন ঃ হে ওকবা, দুনিয়া ও আখেরাতে লোকদের চরিত্রের যে বিষয়টি উত্তম তা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি– যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর। যে তোমার উপর জুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করলেন ঃ ইলাহী, বান্দাদের মধ্যে তোমার কাছে কে অধিক প্রিয়। এরশাদ হল ঃ যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু প্রাপ্যের নালিশ পেশ করল। তিনি তার পক্ষে রায় দেয়ার ইচ্ছায় তাকে বসতে বললেন এবং কথা প্রসঙ্গে বললেন ঃ إِنَّ الْمَظْلُوْمِيْنَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –কেয়ামতের দিন মজলুমরাই সফলকাম হবে। লোকটি এ কথা শুনে তার প্রাপ্য মাফ করে দিল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবা গৃহের তওয়াফ করেন এবং দু'রাকআত নামায আদায় করে কাবায় তশরীফ আনেন। এরপর কাবার চৌকাঠ ধরে সমবেত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখন আমার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? লোকেরা আরজ করল ঃ আপনি আমাদের ভাই এবং মেহেরবান পিতৃব্য পুত্র। তারা একই কথা তিন বার উচ্চারণ করল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি সেই কথাই বলছি যা আমার ভাই হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন–

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ـ

–আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সবার উপরে দয়াশীল।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ লোকেরা একথা শুনে আপন আপন গৃহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে এল, যেমন কবর থেকে বের হয়। অতঃপর সকলেই মুসলমান হয়ে গেল।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সে ব্যক্তি সহনশীল নয়, যে জুলুমের সময় চুপ থাকে, এরপর সক্ষম হলে প্রতিশোধ নেয়; বরং সহনশীল তাকে বলা হয়, যে জুলুমের সময় সহ্য করে এবং সক্ষম হলে মাফ করে। একবার হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বাজারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি কিছু সওদা ক্রয় করে মূল্য দেয়ার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, পকেটের দেরহামগুলো চুরি হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ যে পর্যন্ত এখানে বসা আছি, দেরহামগুলো পকেটে ছিল। লোকেরা চোরকে বদদোয়া দিতে লাগল, তার হাত কাটা যাক, তার অমঙ্গল হোক, কিন্তু হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বললেন ঃ ইলাহী, যদি সে অভাবে পড়ে নিয়ে থাকে, তবে তাকে বরকত দাও, যাতে অভাব দূর হয়ে যায়। আর যদি গোনাহের প্রতি বেপরওয়া হয়ে নিয়ে থাকে, তবে এ গোনাহ্‌কেই তার শেষ গোনাহ্ করে দাও।

খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কাছে ইবনে আশআসের বন্দীরা আগমন করলে তিনি তাদের সম্পর্কে রেজা ইবনে হায়াতের সাথে সলাপরামর্শ করলেন। রেজা আরজ করলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আপনার পছন্দসই বিষয় অর্থাৎ বিজয় দান করেছেন। এর বিনিময়ে আপনি তা করুন যা আল্লাহ তা'আলার পছন্দসই অর্থাৎ আল্লাহ ক্ষমা পছন্দ করেন। আপনিও ক্ষমা করুন। এ কথা শুনে খলীফা সকল বন্দীকে ক্ষমা করলেন।

নম্রতার ফযীলত ঃ নম্রতা একটি উত্তম গুণ, যা সচ্চরিত্রতার ফল। এর বিপরীতে কঠোরতা হচ্ছে ক্রোধের ফল। কঠোরতা কখনও ক্রোধ থেকে এবং কখনও তীব্র লালসা থেকে উৎপন্ন হয়, কিন্তু নম্রতা সর্বাবস্থায় সচ্চরিত্রতার ফল। সচ্চরিত্রতা তখনই অর্জিত হয়, যখন ক্রোধশক্তি ও খাহেশ শক্তিকে সমতার পর্যায়ে রাখা হয়। এ কারণেই 'রিফক' তথা

নম্রতা হাদীস শরীফে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

يَا عَائِشَةُ اِنَّهُ مَنْ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

–হে আয়েশা, যে ব্যক্তি নম্রতার অংশ পেয়েছে, সে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণের অংশ পেয়েছে। আরও বলা হয়েছে–

اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ اَهْلَ بَيْتٍ اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ

–যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন পরিবারের লোকজনকে মহব্বত করেন, তখন তাদের মধ্যে নম্রতা সৃষ্টি করে দেন। আর এক হাদীসে আছে– مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ

–যে নম্রতা পেল না, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রইল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে শাসক নম্রতা প্রদর্শন করে, তার সাথে কেয়ামতে নম্রতা করা হবে। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, সকল মুসলমানই আল্লাহ তাআলার কৃপায় আপনার কাছ থেকে উপকার লাভ করে। কোন উত্তম কথা আমার জন্যেও নির্দিষ্ট করে দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই অথবা তিন বার আলহামদু লিল্লাহ বললেন এবং লোকটির প্রতি মনোযোগী হয়ে দুই অথবা তিন বার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমিই উপদেশ চাও? লোকটি বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি কোন কাজ করার ইচ্ছা কর, তখন পরিণাম চিন্তা করে নাও। যদি ভাল দেখ, কর; নতুবা বিরত থাক।

হযরত সুফিয়ান সওরী তাঁর সহচরগণকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'রিফক' কাকে বলে তোমরা জান? তারা আরজ করল ঃ আপনিই বলে দিন। তিনি বললেন ঃ কঠোরতার জায়গায় কঠোরতা এবং নম্রতার জায়গায় নম্রতা প্রদর্শন করা। এ থেকে জানা গেল, নম্রতার সাথে কঠোরতার মিশ্রণও দরকার, কিন্তু মানুষের স্বভাব অধিক কঠোরতাপ্রবণ বিধায় নম্রতার প্রতি অধিক মাত্রায় উৎসাহ প্রদান জরুরী। এ কারণেই শরীয়তে নম্রতার প্রশংসা অনেক করা হয়েছে এবং কঠোরতার প্রশংসাই পাওয়া যায় না, কিন্তু স্ব স্ব স্থানে উপযোগিতা অনুসারে উভয়টি ভাল। তবে যে স্থানে কঠোরতা জরুরী, সেখানে সত্য মানসিক প্রবৃত্তির সাথে মিশে যায় এবং ঘি চিনির চেয়েও অধিক সুস্বাদু মনে হয়।

হিংসার নিন্দা ঃ হিংসাও বিদ্বেষের একটি শাখা এবং বিদ্বেষ ক্রোধের শাখা। অতএব হিংসা ক্রোধের শাখা এবং ক্রোধ হল মূল কাণ্ড। এরপর

হিংসার এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা বিস্তৃত হয়, যেগুলো গণনাও করা যায় না। হিংসার নিন্দায় বহু হাদীস বর্ণিত আছে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَلْحَسَدُ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ –অগ্নি যেমন লাকড়িকে খেয়ে ফেলে, তেমনি হিংসা নেককাজসমূহ খতম করে দেয়।

অন্য এক হাদীসে হিংসা, তার ফলাফল ও কারণসমূহ নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে ঃ

لاتَحَاسَدُوْا ولاتَقَاطَعُوْا ولاتَبَاغَضُوْا ولاتَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ـ

–পরস্পরে হিংসা করো না, একে অপরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না, পরস্পরে শত্রুতা করো না এবং আত্মীয়তা ভঙ্গ করো না। তোমরা হয়ে যাও আল্লাহ্র বান্দা ভাই ভাই।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন ঃ এখন এ পথে একজন জান্নাতী ব্যক্তি তোমাদের সামনে আসবে। এমন সময় জনৈক আনসারী বাম হাতে জুতা নিয়ে আবির্ভূত হল। তার দাড়ি থেকে ওযুর পানি টপকে পড়ছিল। সে এসেই "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলল। দ্বিতীয় দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার পূর্ববৎ উক্তি করলেন। সেদিনও সে ব্যক্তিই আগমন করল। তৃতীয় দিনেও একই ঘটনা সংঘটিত হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহে চলে গেলে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস আনসারী ব্যক্তির পেছনে পেছনে গেলেন এবং তাকে বললেন ঃ আমার পিতার সাথে আমার কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। এতে আমি কসম খেয়েছি, তিন দিন তাঁর কাছে যাব না। আপনি অনুমতি দিলে তিন দিন আপনার গৃহেই রাত কাটাব। লোকটি বলল ঃ কোন অসুবিধা নেই। আপনি থাকুন। হযরত আবদুল্লাহ তিন রাত্রি পর্যন্ত তার গৃহে শয়ন করে দেখলেন, সে রাতে গাত্রোত্থান করে না, তবে প্রত্যেক পার্শ্ব পরিবর্তনের সময় আল্লাহর যিকির করে নেয়। তাহাজ্জুদের নামাযের সময় শয্যাত্যাগ করে না। অবশ্য এতটুকু জানা গেল, সে যখন কোন কথা বলেছে, ভাই বলেছে। তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে হযরত আদুল্লাহ তার আমলের কোন ওজনই বুঝতে পারলেন না। অগত্যা তিনি লোকটিকে বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা, আমার পিতার সাথে আমার কোন বাদানুবাদ হয়নি; কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে আপনার শানে একথা শুনেছিলাম। তাই আপনি কি

আমল করেন, তা দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আপনাকে তো খুব বেশী আমল করতে দেখলাম না। বলুন তো, কিভাবে আপনি জান্নাতী হওয়ার মর্যাদা লাভ করলেন? লোকটি বলল ঃ আমার আমল তো তাই, যা আপনি প্রত্যক্ষ করলেন। আমি তার কাছ থেকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। কিছু দূর অগ্রসর হতেই সে আমাকে ডেকে নিল এবং বলল ঃ ভাই, আমল তো তাই, যা আপনি দেখেছেন, কিন্তু ব্যাপার এতটুকু, যে নেয়ামত আল্লাহ তাআলা কোন মুসলমানকে দান করেন, তাতে আমার মনে কোনরূপ মলিনতা ও হিংসা আসে না। আমি বললাম ঃ ব্যস, এ কারণেই আপনি এই মর্যাদা লাভ করেছেন। আমাদের দ্বারা এটা সম্ভবপর নয়।

এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি বিষয় থেকে কেউ মুক্ত নয়। এক– ধারণা, দুই– কুলক্ষণ, তিন– হিংসা, কিন্তু আমি তোমাদেরকে এগুলো থেকে মুক্তির উপায় বলে দিচ্ছি। যখন মনে কোন ধারণা আসে, তখন তা ঠিক মনে করবে না। যখন কুলক্ষণ দেখ, তখনও নিজের কাজ করে যাও। আর হিংসার উদ্রেক হলে খাহেশ করো না। এ হাদীস হতে হিংসা থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাব্যতা বুঝা যায়।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) যখন পরওয়ারদেগারের সাথে কথা বলার জন্য গমন করেন, তখন এক ব্যক্তিকে আরশের ছায়ায় দেখে ঈর্ষা করতে থাকেন যে, এহেন উচ্চ মর্যাদা যদি আমারও নসীব হত! সেমতে তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে লোকটির নাম বলে দেয়ার আবেদন পেশ করলেন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করলেন ঃ তার নাম দিয়ে কি করবে, কাম শুনে নাও। সে তিনটি কাজ করত– এক, মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত দেখে হিংসা করত না। দুই, পিতা-মাতার নাফরমানী করত না। তিন– চোগলখোরী করত না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি আমার উম্মতের জন্যে এ বিষয়ের আশংকা বেশী করি যে, তাদের মধ্যে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে এবং তারা পরস্পরে হিংসা করে খুনাখুনি করবে।

বর্ণিত আছে, ফযল ইবনে মুহাল্লাব যখন ওয়াসেতের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন আউন ইবনে আবদুল্লাহ তার কাছে যান এবং বলেন ঃ আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিতে চাই। ফযল বললেন ঃ বলুন। তিনি বললেন ঃ

প্রথমঃ অহংকার থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার প্রথম নাফরমানী এর কারণেই হয়েছে। সেমতে কোরআন পাকে এর সত্যায়ন বিদ্যমান–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

–স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সেজদা কর, তখন তারা সেজদা করল; কিন্তু ইবলীস করল না। সে অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং কাফেরেদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

দ্বিতীয় ঃ লালসা থেকে বেঁচে থাকবে। এটা বড় বিপদ, যার কারণে হযরত আদম (আঃ) জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে জান্নাতে স্থান দেন, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সেখানে তাঁকে সকল বস্তু খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়; কেবল একটি বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করা হয়, কিন্তু তিনি লালসার বদৌলতে সেই ফল খান এবং জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁকে আদেশ করা হয়- اِهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ –তোমরা সকলেই জান্নাত থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু।'

তৃতীয় ঃ হিংসা থেকে বেঁচে থাকবে। এ হিংসার কারণেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কাবিল তার ভাই হাবিলকে খুন করেছিল। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ـ

–তাদেরকে আদম পুত্রদ্বয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করে শুনান, যখন তারা উভয়েই কোরবানী করল, অতঃপর একজনের কোরবানী কবুল হল এবং অপরজনের হল না, তখন সে বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমাকে খুন করব।

আরেকটি বিষয়, যখন সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা, জ্যোতির্বিদ্যার কথা আলোচনা করা হয় তখন তুমি চুপ থাকবে।

জনৈক ব্যক্তি হযরত হাসানকে প্রশ্ন করল ঃ ঈমানদার হিংসা করে? তিনি বললেন ঃ তুমি কি ইয়াকুব (আঃ)-এর পুত্রদের কথা ভুলে গেছ? তারা ঈমানদার ছিল। সুতরাং ঈমানদার হিংসা করে, কিন্তু তার উচিত বুকের মধ্যেই তা গোপন রাখা। কেননা হাতে ও মুখে বাড়াবাড়ি না করা পর্যন্ত হিংসা দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না। হযরত আবুদ্ দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করবে, তার হাসি ও হিংসা উভয়টি হ্রাস পাবে। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) বলেন ঃ আমি সকল মানুষকে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা রাখি; কিন্তু নেয়ামতের কারণে যে হিংসা করে, তাকে

সন্তুষ্ট করতে পারি না। সে নেয়ামতের বিলুপ্তি ছাড়া সন্তুষ্ট হয় না। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ হিংসা একটি ক্ষত, যা কখনও শুকায় না।

হিংসার স্বরূপ, প্রকার ও বিধান ঃ বলাবাহুল্য, নেয়ামতের উপর ভিত্তি করেই হিংসা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন বান্দাকে নেয়ামত দান করেন, তখন অপর ব্যক্তির দু'রকম অবস্থা হতে পারে।

প্রথম হচ্ছে, সেই নেয়ামত তার কাছে খারাপ মনে হবে এবং সে তার বিলুপ্তি কামনা করবে। তার এই অবস্থার নামই হিংসা। এ থেকে জানা গেল, হিংসার সংজ্ঞা হচ্ছে, অপরের নেয়ামত দেখে দুঃখিত হওয়া এবং তার কাছ থেকে তার বিলুপ্তি কামনা করা।

দ্বিতীয় হচ্ছে, অপরের সেই নেয়ামত তার কাছে খারাপ মনে হবে না এবং সে তার বিলুপ্তিও কামনা করবে না; বরং তার মন চাইবে, এই নেয়ামত আমিও পাই। এই অবস্থাকে বলা হয় "গিবতা" তথা ঈর্ষা। কখনও হিংসাকে ঈর্ষার জায়গায় এবং ঈর্ষাকে হিংসার জায়গায় ব্যবহার করা হয়। অর্থ জানা থাকলে এতে কোন অসুবিধা হয় না।

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

المؤمن يغبط والمنافق يحسد

–মুমিন ঈর্ষা করে এবং মোনাফেক হিংসা করে।

অতএব হিংসা সর্বাবস্থায় হারাম, কিন্তু যে নেয়ামত কোন পাপাচারী অথবা কাফেরের হাতে পড়ে এবং তদ্দ্বারা সে ফেতনা ফাসাদ ও উৎপীড়ন করে, সেই নেয়ামতকে ঐ ব্যক্তির হাতে খারাপ মনে করা এবং তার বিলুপ্তি কামনা করা গোনাহ্ নয়। কেননা, এখানে স্বয়ং নেয়ামতের উপর হিংসা হয় না; বরং সেটা ফেতনা ফাসাদের সামগ্রী বিধায় হিংসা করা হয়। হিংসা যে হারাম, এ বিষয়ে হাদীসসমূহ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া অপরের নেয়ামতকে খারাপ মনে করা আল্লাহ্ তাআলার বিধানে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার নামান্তর যে, তিনি এক বান্দাকে অপর বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন কেন?

আল্লাহ্ তা'আলাও বহু জায়গায় হিংসার নিন্দা করেছেন। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ-

ان مستكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها

–যদি তোমরা কিছু কল্যাণ প্রাপ্ত হও তবে তাদের খারাপ লাগে। আর যদি তোমাদের কোন অকল্যাণ ঘটে তবে তারা তজ্জন্যে উলসিত হয়ে উঠে।

ود كثير من اهل الكتب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم -

গ্রন্থধারীদের অনেকেই কামনা করে, তোমাদেরকে মুমিন হওয়ার পরে কাফেরে পরিণত করে দেয়– নিজেদের পক্ষ থেকে হিংসার কারণে। এখানে বলা হয়েছে, কাফেররা যে ঈমানরূপী নেয়ামতের অবসান চায়, তা হিংসার কারণে।

لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء যদি তোমরাও কাফের হয়ে যাও যেমন তারা কাফের হয়েছে, অতঃপর সকলেই সমান হয়ে যাবে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতাদের হিংসা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের মনের কথা এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে–

اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفى ضلل مبين اقتلوا يوسف اواطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم -

–যখন তারা বলল ঃ অবশ্য ইউসুফ ও তার ভ্রাতা আমাদের পিতার অধিক প্রিয়। অথচ আমরা একটি বড় দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে আছেন। তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা কোন দেশে পাঠিয়ে দাও। এতে তোমরা তোমাদের পিতার মনোযোগ একান্তভাবে পাবে। অর্থাৎ হযরত ইউসুফের প্রতি পিতার মহব্বত যখন ভ্রাতাদের কাছে দুর্বিষহ ঠেকল, তখন তার অবসানের কথা চিন্তা করে তাকে পিতার দৃষ্টি থেকে উধাও করে দিল।

ولا يجدون فى صدورهم حرجا مما اوتوا

–তারা আপন অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব করে না অন্যেরা যা প্রাপ্ত হয়েছে তা থেকে।

এতে যারা হিংসা করে না, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

ايحسدون الناس على ما اتهم الله من فضله –আল্লাহ্ মুমিনদেরকে যে কৃপা দান করেছেন, তজ্জন্যে তারা হিংসা করে কি?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পূর্বে ইহুদীরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হত, তখন এই বলে দোয়া

করত, ইলাহী! সেই পয়গম্বরের ওসিলায়, যাঁকে প্রেরণ করার ওয়াদা তুমি আমাদেরকে দিয়েছ এবং সেই কিতাবের ওসিলায়, যা তাঁর প্রতি নাযিল করবে, আমাদেরকে বিজয় দান কর। এই দোয়ার বরকতে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করত, কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হয়ে যখন আবির্ভূত হলেন, তখন পরিচয় পেয়ে তারা মানতে অস্বীকার করল। সেমতে আল্লাহ্ বলেন–

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ -

–ইতিপূর্বে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত। অতঃপর যখন পরিচিতিজন আগমন করল, তখন তারা তাকে মানতে অস্বীকার করল।'

উম্মুল মুমেনীন সফিয়্যা বিনতে হুয়াই একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আরজ করলেন ঃ একদিন আমার পিতা ও চাচা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে গৃহে গেলেন। আমার পিতা চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি হযরতের শানে কি বল? চাচা জওয়াব দিলেন ঃ আমার জানামতে তিনি সেই পয়গম্বর, যাঁর সুসংবাদ হযরত মূসা (আঃ) দিয়েছিলেন। এরপর চাচা পিতাকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার কি বিশ্বাস ? পিতা বললেন ঃ আমি তো সারাজীবন তার শত্রুই থাকব।

এখন ঈর্ষার বিধান জানা উচিত। ঈর্ষা হারাম নয়। এ সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে– وَفِى ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ এ বিষয়ে ঈর্ষাকারীদের ঈর্ষা করা উচিত। হাদীস শরীফে এ কথা স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

لَاحَسَدَ اِلَّا فِى اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَهُوَ يَعْلَمُهُ النَّاسَ -

'দু'ব্যক্তির ব্যাপারেই ঈর্ষা করা যায় –প্রথম, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। দ্বিতীয়, যাকে আল্লাহ এলেম দিয়েছেন। অতঃপর সে তা মানুষকে শিক্ষা দেয়।'

এই হাদীসে حسد (হিংসা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; অথচ আলোচনা ছিল ঈর্ষার। এর জওয়াব পূর্বেই লেখা হয়েছে, غبطه ও

حسد একে অপরের জায়গায় ব্যবহৃত হয় এবং স্থানের ইঙ্গিতে অর্থ নেয়া হয়।

জানা উচিত, যে নেয়ামতের উপর ঈর্ষা করা হয়, তা যদি ধর্মীয় ও ফরয নেয়ামত হয়; যেমন-ঈমান, নামায, যাকাত ইত্যাদি, তবে ঈর্ষা করা ওয়াজিব; অর্থাৎ এরূপ কামনা করা ওয়াজিব যে, এ নেয়ামত আমারও নসীব হোক। আর যদি ফযীলত তথা শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত নেয়ামত হয়; যেমন নফল দান-খয়রাতে অর্থকড়ি ব্যয় করা, তবে ঈর্ষা করা মোস্তাহাব।

হিংসার কারণ ঃ হিংসার কারণ সাধারণতঃ সাতটি ঃ (১) শত্রুতা। এটি হিংসার সর্বাধিক শক্তিশালী কারণ। কেননা, যাকে কেউ কোন কারণে জ্বালাতন করে, সে জ্বালাতনকারীর প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে এবং প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক থাকে। যদি নিজেকে প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম পায়, তবে কমপক্ষে এটা করে যে, প্রতিপক্ষ কোন বালামসিবতের সম্মুখীন হলে সে মনে করে, এটা কেবল আমার উপর জুলুম করার করণে হয়েছে। সে তখন বলতে থাকে, আল্লাহ্ আমার ফরিয়াদ শুনেছেন। পক্ষান্তরে যদি প্রতিপক্ষ কোন নেয়ামতের অধিকারী হয়ে যায়, তবে সে খারাপ মনে করে এবং বলতে থাকে, আল্লাহ আমার প্রতি লক্ষ্য করলেন না এবং আমার শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলেন না; বরং আরও নেয়ামত দান করেছেন। সার কথা, যেখানে বিদ্বেষ ও শত্রুতা, সেখানে হিংসা অপরিহার্য। এ হিংসা কেবল সমকক্ষের সাথেই হয় না; বরং নীচতম ব্যক্তিও রাজা-বাদশাহদের সাথে করতে থাকে; অর্থাৎ শত্রুতার কারণে সে চায়, তার ধনৈশ্বর্য বিলীন হয়ে যাক। পরহেযগার সাবধানী ব্যক্তির উচিত এ ধরনের হিংসা অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা। এ হিংসার কারণেই কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ -

–তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা মুসলমান। আর যখন একান্তে যায়, তখন তোমাদের বিরুদ্ধে রাগে অঙ্গুলি কাটে। বলে দিন– তোমরা তোমাদের শত্রুতা নিয়ে মর। আল্লাহ অন্তরের কথা জানেন।

এই শত্রুতাজনিত হিংসার ফলে কখনও মারামারি ও খুনাখুনি পর্যন্ত হয়ে যায়, কখনও নেয়ামত দূর করার উপায় চিন্তা করতে করতে সারাজীবন অতিবাহিত হয়ে যায়, কিংবা সর্বদা চোগলখোরী ও মানহানিকর কথাবার্তায় ব্যাপৃত থাকে।

(২) সমকক্ষ ব্যক্তির মান-সম্মান অসহ্য হওয়া। উদাহরণতঃ যদি কোন সমকক্ষ ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা, ধন-সম্পদ অথবা বিদ্যার অধিকারী হয়ে যায়, তবে হিংসাকারী আশংকা করে সে যেন তার সাথে অহংকার ও গর্ব করতে পারে। সে নিজে তো অহংকার করতে চায় না; কিন্তু অপরের অহংকার ও আস্ফালন সহ্য করতে পারে না। তাই হিংসা করতে থাকে, অপর ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক জ্ঞানীগুণী কেন হবে?

(৩) অপরকে হেয় জ্ঞান করা। উদারণতঃ এক ব্যক্তি অপরকে হেয় ও নগণ্য জ্ঞান করে তার কাছ থেকে খেদমত এবং আনুগত্য আশা করে। এখন সে যদি নেয়ামত ও ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়, তবে হিংসাকারী আশংকা করে, এখন সে হয় তো তার আনুগত্য করবে না এবং সমকক্ষ হওয়ার দাবী করবে, ফলে তার সরদারী মাঠে মারা যাবে।

এ ধারণার বশবর্তী হয়েই কাফেররা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হিংসা করত। যেমন কোরআন পাক সাক্ষ্য দেয়–

لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

–কাফেররা বলত, এই কোরআন দুজনপদের (মক্কা ও তায়েফের) এক মহান ব্যক্তির প্রতি নাযিল করা হল না কেন? অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ) মহান ব্যক্তি হলে তার আনুগত্য আমাদের জন্যে কঠিন হত না। একজন এতীম বালকের সামনে মাথানত করা কিরূপে সম্ভবপর? এমনিভাবে কোরায়শ কাফেররা আরও বলত-

أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ -

–আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের মধ্য থেকে এদের প্রতিই অনুগ্রহ করলেন? আল্লাহ তা'আলা কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে জানেন না?'

মুসলমানদেরকে হেয় জ্ঞান করা এবং নিজেদেরকে সম্মানিত মনে করার কারণে তারা এ উক্তি করত।

(৪) হিংসার চতুর্থ কারণ আশ্চর্যবোধ করা; অর্থাৎ হিংসাকারী যখন কোন ব্যক্তির কাছে কোন বড় নেয়ামত অথবা বড় পদমর্যাদা দেখে, তখন এই ভেবে আশ্চর্যবোধ করে যে, আমিও তো তারই মত একজন, অথচ আমি পাইনি, সে এই মর্যাদা পেয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন– مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

–তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ।

وَقَالُوْا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِّثْلِنَا –তারা বলল ঃ আমরা কি আমাদের মতই একজন মানুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব!

لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ –যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের কথা মেনে চল, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এসব আয়াতে কাফেরদের বিস্ময়ই প্রকাশ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাদেরই মত মানুষ, সে রেসালত, ওহী ও নৈকট্যের মর্তবায় কিরূপে পৌঁছে গেল। এর ভিত্তিতেই তারা রসূলগণের সাথে হিংসা করেছে। এখানে অন্য কোন কারণ, যেমন শত্রুতা, অহংকার, ক্ষমতা অন্বেষণ ইত্যাদি ছিল না।

(৫) প্রার্থিত লক্ষ্য হাতছাড়া হওয়ার ভয়; অর্থাৎ অপরের নেয়ামতের কারণে আপন লক্ষ্য নষ্ট হয়ে যাবে – এরূপ আশংকা করার কারণে হিংসা করা। এই প্রকার হিংসা এমন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যার দাবীদার দু'জন। তাদের মধ্যে কেউ যখন এমন বস্তু পেয়ে যায়, যদ্দ্বারা লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়। তখন অপরজন অহেতুক তার সাথে হিংসা করতে থাকে। দু'ভাইয়ের মধ্যেও এরূপ হিংসা হয় যখন প্রত্যেকেই পিতামাতার অন্তরে আসন করে নিতে আগ্রহী হয়, যাতে তাদের কাছে যোগ্য প্রতিপন্ন হয়ে ধনসম্পদের মালিক হয়ে যায়।

(৬) ক্ষমতার মোহ; অর্থাৎ এরূপ কামনা করা যে, আমি যেমন কবি, সাহিত্যিক, কারিগর অথবা বীর, তেমনটি আর কেউ না হোক। আমার শাস্ত্রে আর কোন সমতুল্য ব্যক্তি না থাকলে মানুষ আমার প্রশংসা করবে এবং আমাকে অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলবে। এ ব্যক্তি যদি তার আশেপাশে প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা শুনে, তবে অবশ্যই খারাপ মনে করবে এবং হয় মৃত্যু কামনা করবে, না হয় সেই শাস্ত্রের বিলুপ্তি কামনা করবে, যার কারণে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও অংশীদার হয়েছে। এই হিংসা বীরত্ব, বিদ্যা, এবাদত, পেশা, দৈহিক সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ ইত্যাদি যেকোন শাস্ত্রে ও ক্ষেত্রে হতে পারে। একেই বলা হয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মোহ। ইহুদী আলেমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে চিনতে পেরেও ও তাঁর অনুসরণ করতে অস্বীকার করত, তার কারণ এটাই ছিল। তারা আশংকা করত, যখন তাদের এলেম রহিত সাব্যস্ত হবে, তখন তাদের প্রতিপত্তির বড়াই চূর্ণ হয়ে যাবে। কেউ তাদের অনুসরণ করবে না।

(৭) অন্তরের ভ্রষ্টতা ও হীনমন্যতার কারণে হিংসা করা হবে; অর্থাৎ হিংসার কারণ উপরে বর্ণিত ছয়টি বিষয়ের মধ্য থেকে একটিও হবে না;

বরং নিছক হীনমন্যতা ও নীচাশয়তাই হবে হিংসার কারণ। বলাবাহুল্য এমন অনেক মানুষ পাওয়া যায় যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি মোহ নেই, অহংকার নেই এবং অর্থলোভও নেই; কিন্তু যখন তাদের সামনে আলোচনা করা হয়, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা এই নেয়ামত দান করেছেন, তখন এটা তাদের কাছে দুঃসহ ঠেকে। পক্ষান্তরে তাদের সামনে মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা বলা হলে তারা আনন্দিত হয়। এ ধরনের মানুষ সর্বদাই অপরের বিপযর্য় কামনা করে। মানুষের প্রতি আল্লাহর দান তারা দেখতে পারে না। মানুষকে যা দেয়া হয় তা যেন তাদেরই ধনভাণ্ডার থেকে দেয়া হয়। এরূপ লোককে বলা হয় "শাহীহ্" অর্থাৎ কৃপণ থেকেও নিকৃষ্ট। কারণ কৃপণ তাকে বলা হয়, যে নিজের মাল কাউকে দেয় না। আর শাহীহ্ ঐ ব্যক্তি যে অপরের মালে কৃপণতা করে। এই হিংসাকারীরাও অহেতুক আল্লাহ্ তাআলার দানে নাখোশ হয়; অথচ দান যারা পায় তাদের সাথে এই হিংসাকারীদের কোন শত্রুতা থাকে না। হীনমন্যতা ছাড়া তাদের হিংসার কোন বাহ্যিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ ধরনের হিংসার প্রতিকার খুবই কঠিন। কেননা, অন্যান্য কারণের বেলায় ধরে নেয়া যায় যে, কারণ দূরীভূত হয়ে গেলে হিংসাও দূরীভূত হয়ে যাবে, কিন্তু এটা হচ্ছে সৃষ্টিগত ভ্রষ্টতা। এটা দূর করা অত্যন্ত দুরূহ।

উল্লিখিত সাতটি কারণের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে কতক কিংবা অধিকাংশ কারণ একই ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হয়ে যায়। তখন তার হিংসার মাত্রাও বেড়ে যায়, যা সে গোপন করতে পারে না। আমাদের যুগে প্রচলিত অধিকাংশ হিংসার মধ্যে একাধিক কারণই একত্রিত থাকে– একা এক কারণ থাকে না।

আপনজনের সাথে হিংসা বেশী হয় কেন? প্রকাশ থাকে যে, হিংসার উপরোক্ত কারণসমূহ তাদের মধ্যেই বেশী থাকে, যারা পরস্পর বেশী সম্পর্কশীল। ফলে তারা মজলিসে বসে পরস্পরে কথাবার্তা বলে এবং আপন আপন মতলব বর্ণনা করে। তখন যদি কেউ কারও মতলবের বিপক্ষে বলে তবে মতলবওয়ালা তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে এবং কোন না কোনরূপে এর শোধ নিতে চায়। মোট কথা, কাছে বসা এবং মতলবের কথা বলা থেকে হিংসার উৎপত্তি। এ কারণেই এক ব্যক্তি এক শহরে এবং অন্য ব্যক্তি অন্য শহরে বাস করলে তাদের মধ্যে হিংসা হয় না। এমনকি, দূরবর্তী দু'মহল্লায় বাস করলেও হিংসা হয় না। তবে এক মজলিস, এক মাদ্রাসা, এক মসজিদ অথবা এক বাজারে একত্রিত থাকলে এবং একই মতলবের দাবীদার হলে

হিংসা হয়। এ জন্যেই আলেম ব্যক্তি আলেমের সাথে হিংসা করে– মুজাহিদের সাথে করে না। এক ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ীর সাথে হিংসা করে– মুচির সাথে করে না। কেননা, তারা এক পেশায় একত্রিত নয়। এই একই কারণে মানুষ তার ভাই ও চাচাত ভাইয়ের সাথে অন্যের তুলনায় বেশী হিংসা করে। দুই সতীন পরস্পরে শাশুড়ী ও ননদের তুলনায় বেশী হিংসা করে। মোট কথা, যেখানেই দু'ব্যক্তির মতলব এক হবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমাবেশ ও উঠাবসা হবে, সেখানেই হিংসা বেশী হবে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, হিংসার যত কারণ রয়েছে, সবগুলোর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। কেননা, দুনিয়ার বস্তুসমূহ অংশীদারদের জন্যে যথেষ্ট হয় না। একজনের কাছে গেলে অন্যজনের হাত খালি থেকে যায়, কিন্তু আখেরাতের বস্তুসমূহের মধ্যে কোন অভাব অনটন নেই। সেগুলোর ধারণ ক্ষমতা অপরিসীম। অংশীদার যতই হোক, বস্তুর কমতি নেই; বরং বিদ্যার মত "যতই করবে দান ততই যাবে বেড়ে।" সুতরাং যে কেউ আল্লাহর মারেফত অর্জন করে, সে তাতে অন্যের সাথে হিংসা করে না। কারণ, মারেফতে কোন কমতি নেই যে, একজন সাধক যে হাল জেনে নেয়, অন্যজন তা জানতে পারবে না; বরং লাখো সাধক একটি হাল জেনেই আনন্দিত হয় এবং স্বাদ গ্রহণ করে। একজনের আনন্দে অন্যজন অন্তরায় হয় না; বরং তাদের সংখ্যা যত বেশী হয়, স্বাদও তত বেশী হয়। এ কারণেই যাঁরা হক্কানী আলেম, তাঁদের মধ্যে হিংসা নেই। কারণ, তাঁদের মতলব হচ্ছে আল্লাহর মারেফত ও নৈকট্যলাভ। এগুলো হচ্ছে অতল সমুদ্র। হাঁ, এলেম দ্বারা আলেমদের উদ্দেশ্য যদি ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে হিংসা দেখা দেবে। কেননা, ধন-সম্পদ এমন শরীরী বস্তু, যা একজনের থাকলে অন্যজনের থাকে না। আর প্রভাব প্রতিপত্তির মানে হচ্ছে অন্তরে স্থান করে নেয়া। যখন কারও অন্তরে একজন আলেমের স্থান হয়ে যাবে, তখন অপরের জন্যে স্থান থাকবে না অথবা হ্রাস পাবে। এটাই হবে শত্রুতা ও হিংসার কারণ।

হিংসার চিকিৎসা ঃ হিংসা অন্তরের বড় রোগসমূহের অন্যতম। প্রত্যেক আন্তরিক রোগের চিকিৎসা এলেম ও আমল দ্বারা হয়ে থাকে। হিংসা রোগের জন্যে যে এলেম উপকারী, তা একথা নিশ্চিতরূপে জানা যে, হিংসা হিংসাকারীর জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে আদি অন্ত ক্ষতিকর এবং যার সাথে সাথে হিংসা করা হয়, তার দুনিয়া ও আখেরাতের কিছুই ক্ষতি হয় না; বরং উপকারই উপকার হয়। একথা জানার পর যদি কেউ নিজের দুশমন না হয়, তবে অবশ্যই হিংসা ত্যাগ করবে। হিংসার কারণে

হিংসাকারীর যে ধর্মীয় ক্ষতি হয়, তা হল, সে আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকে না এবং যে নেয়ামত তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে বন্টন করেছেন তাকে খারাপ মনে করে। বলাবাহুল্য, আল্লাহর তকদীরে রাযী না থাকার চেয়ে বড় গোনাহ্ ধর্মে আর কি হবে? তদুপরিহিংসার কারণে হিংসাকারী একজন মুসলমানের সাথে শুভেচ্ছামূলক ব্যবহার করে না। ফলে সে নবী ওলীগণের কাতার থেকে খারিজ হয়ে যায়। কেননা, তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকেন। শয়তান, ইবলীস ও কাফেররা মুমিনদের অকল্যাণ কামনা করে। হিংসাকারী ব্যক্তিও অনুরূপ কাজ করার কারণে তাদের দলভুক্ত হয়ে যায়। এসকল বিষয় হচ্ছে অন্তরের নষ্টামি, যা পুণ্য কর্মকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন অগ্নি লাকড়ি খেয়ে ফেলে এবং পুণ্য কর্মের চিহ্ন এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন রাত দিনের চিহ্ন মুছে দেয়।

দুনিয়াতে হিংসাকারীর ক্ষতি হচ্ছে, সে সর্বদা দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা ও যন্ত্রণার মধ্যে থাকে। তার শত্রুদের প্রতি যতই আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত বর্ষিত হতে থাকে, ততই তার অন্তর জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শত্রুদের বিপদ যতই চলতে থাকে, ততই উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা তাকে গ্রাস করতে থাকে। সে বিমর্ষ ও বঞ্চিত সেজে চলাফেরা করে। সে তার শত্রুর জন্যে যে বিষয়টি কামনা করে, তাতে নিজেই পতিত হয়। তার বাসনা ছিল, শত্রু দুঃখ-কষ্টে পড়ুক; কিন্তু নিজেই দুঃখ যন্ত্রণার জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। অথচ যার সাথে হিংসা, তার নেয়ামতও বিনষ্ট হয় না। যদি কেয়ামত ও হিসাব-কিতাবের প্রতিও মানুষের ঈমান না থাকে, তবুও বুদ্ধিমানের জন্যে বুদ্ধিমত্তার দাবী এটাই যে, সে হিংসা থেকে বেঁচে থাকুক। আখেরাতের আযাবের প্রতি বিশ্বাস থাকলে তো হিংসা থেকে বেঁচে থাকা আরও উত্তমরূপে সিদ্ধ হয়।

যে ব্যক্তির সাথে হিংসা করা হয়, তার দ্বীন ও দুনিয়াতে হিংসার কারণে কোন ক্ষতি হয় না, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, হিংসার কারণে তার নেয়ামত বিলুপ্ত হয় না, হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা কারও জন্যে যে নেয়ামত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবশ্যই থাকবে। একে প্রতিহত করার উপায় নেই। এ কারণেই জনৈকা মহিলাকে শাসক হয়ে প্রজাদের উপর জুলুম করতে দেখে যখন একজন পয়গম্বর আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করলেন, তখন এরশাদ হয় ঃ আমি আদিকালে যা কিছু নির্ধারণ করে দিয়েছি, তাতে পরিবর্তন হতে পারে না। যে পরিমাণ সৌভাগ্য ও পদমর্যাদা এই মহিলার জন্য লেখা হয়েছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তোমার যদি খারাপ লাগে, তবে তার সম্মুখ থেকে চলে যাও। মোট কথা, যখন হিংসার কারণে নেয়ামত দূর হয় না,

তখন যার হিংসা করা হয়, তার দুনিয়াতে আর কি ক্ষতি হবে এবং আখেরাতেই তার কি গোনাহ্ হবে! যদি হিংসার কারণেই নেয়ামত দূর হয়ে যেত, তবে দুনিয়াতে কারও কাছে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত থাকত না; ঈমানের নেয়ামতও কেউ লাভ করতে পারত না। কেননা, কাফেররা তো ঈমানের উপরই মুসলমানদের সাথে হিংসা করে যেমন কোরআন বলে ঃ

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ ـ

গ্রন্থধারীদের মধ্যে অনেকেরই বাসনা, যদি তারা তোমাদেরকে ঈমানের পরে কাফের বানিয়ে দিতে পারে! এটা তাদের তরফ থেকে হিংসার কারণে।

সুতরাং যদি কেউ কামনা করে, তার হিংসার কারণে অপরের নেয়ামত বিলুপ্ত হোক, তবে সে যেন এটা চায়, কাফেরদের হিংসার কারণে তার ঈমানরূপী নেয়ামত বিলুপ্ত হোক। অন্যান্য নেয়ামতের বেলায়ও এরূপ বুঝা দরকার।

এ পর্যন্ত এলেম দ্বারা হিংসা রোগের চিকিৎসার কথা বলা হল। এখন আমল দ্বারা চিকিৎসার কথা বলা হচ্ছে।

হিংসা যা দাবী করে কথায় কাজে তার খেলাফ করতে হবে। উদাহরণতঃ হিংসা যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিন্দা বর্ণনা করার দাবী করে, তবে মনের উপর জোর দিয়ে মুখে তার প্রশংসা করবে। আর যদি হিংসার কারণে অহংকার করতে মনে চায়, তবে জোরপূর্বক বিনীত ও নম্র ব্যবহার করবে। যদি হিংসা দান না করতে প্ররোচিত করে, তবে পূর্বে যেরূপ দান করা হত তার চেয়ে বেশী পরিমাণে দেয়ার অভ্যাস করবে। যখন মনের উপর জোর দিয়ে চেষ্টা সহকারে এসব কাজ করবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানবে, তখন সে খুশী হয়ে যাবে এবং মহব্বত করতে শুরু করবে। তার পক্ষ থেকে মহব্বত হলে হিংসাকারীও মহব্বত করতে বাধ্য হবে। পারস্পরিক এই ঐক্য ও মহব্বতের কারণে হিংসার বীজ সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে শয়তান হিংসাকারীকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, তুমি বিনয় ও প্রশংসা করলে প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে অক্ষম হয়ে, বিপজ্জনক অথবা কপট প্রতিপন্ন হবে। মানুষের উচিত শয়তানের এহেন প্রতারণায় না পড়া; বরং জানা দরকার, সদ্ব্যবহার জোরপূর্বক হোক কিংবা স্বভাবগতভাবে হোক– উভয়পক্ষের শত্রুতা নির্মূল করে দেয়, হিংসার দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং অন্তর সম্প্রীতি ও মহব্বতের দিকে ফিরে আসে। হিংসার এই চিকিৎসাটি খুবই উপকারী। কারণ, এটা অত্যধিক তিক্ত। যে ব্যক্তি ওষুধের তিক্ততায় সবর করে না, সে আরোগ্য লাভের মিষ্টতা আস্বাদন করে না।

যে পরিমাণ হিংসা দূর করা ওয়াজিব ঃ জানা উচিত, কষ্টদাতার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ক্রোধ হয়। উদাহণতঃ যদি তোমাকে কেউ কষ্ট দেয়, তবে তুমি তার প্রতি শত্রুতা না রাখ, অথবা সে কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হলে তুমি তা খারাপ মনে না করা সম্ভব হবে না। তার ভাল-মন্দ উভয় অবস্থায় তোমার অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই হবে। এদিকে শয়তানও তোমাকে সর্বদা হিংসার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকবে। যদি হিংসার প্রেরণা প্রবল হয়ে যায় এবং তোমার ইচ্ছাকৃত কথা ও কাজে তা প্রকাশ পেতে থাকে, তবে তুমি হিংসাকারী ও পাপী সাব্যস্ত হবে। আর যদি তুমি তোমার বাহ্যিক অবস্থাকে এসব বিষয় থেকে বিরত রাখ, কিন্তু অন্তরে তার নেয়ামর বিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর এবং একে খারাপও মনে না কর, তবুও তুমি হিংসাকারী ও গোনাহগার হবে। কেননা, হিংসা অন্তরের একটি অবস্থাকে বলা হয়। হিংসার কারণে যেসকল কাজ প্রকাশ পায়, যেমন গীবত, মিথ্যাচার ইত্যাদি, সেগুলো সাক্ষাৎ হিংসা নয়। হিংসার স্থান অন্তরই– বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গে নয়। হাঁ পার্থক্য হচ্ছে, যে হিংসা কেবল অন্তরেই থাকে এবং বাহ্যিক কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মে প্রকাশ পায় না, তাতে বান্দার কোন হক থাকে না যে, ক্ষমা করিয়ে নেয়া ওয়াজিব হবে; বরং এই প্রকার হিংসার কারণে হিংসাকারী ব্যক্তি শুধু আল্লাহর কাছে গোনাহ্গার সাব্যস্ত হয়। হিংসার কারণাদি যেখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ফুটে উঠে, সেখানেই কেবল মাফ করিয়ে নেয়া ওয়াজিব হয়।

এখন যদি কেউ বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখার পর অন্তর দিয়ে নেয়ামতের বিলুপ্তি কামনাও খারাপ মনে করে, তবে এটা বিবেকের পক্ষ থেকে হবে; অর্থাৎ স্বভাবের দিক থেকে নেয়ামত বিলুপ্তির যে খাহেশ পাওয়া যাবে, বিবেক তা বদলে দেবে। মানুষ দুনিয়ার আনন্দ জালে জড়িত থাকলে স্বভাবকে এভাবে বদলে দেয়া অসম্ভব। হাঁ, যদি কেউ আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে নিমজ্জিত থাকে এবং তাঁর এশকের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে যায়, তবে এটা সম্ভব। এমতাবস্থায় সে মানুষের পৃথক পৃথক অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। সবাইকে একই দৃষ্টিতে দেখবে। সকলকে আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের ক্রিয়াকর্মকে আল্লাহর ক্রিয়াকর্ম মনে

করবে। এ অবস্থা কারও অর্জিত হলেও সার্বক্ষণিক হয় না। বিদ্যুতের মত এসে মুহূর্তের মধ্যে উবে যায়। এরপর অন্তর আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। অভিশপ্ত শয়তান পুনরায় তার মনে কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করতে থাকে। যদি কেউ এই বিতাড়িত শয়তানের মোকাবিলায় বিবেকের জোরে তার কথা অপছন্দ করে, তবে সে নিজের উপর ওয়াজিব কর্তব্য সম্পাদন করে ফেলে।

কেউ কেউ বলেন ঃ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিংসা প্রকাশ না পেলে গোনাহ্ হয় না। হযরত হাসানকে কেউ হিংসা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ হিংসা গোপন রাখা উচিত। এতে কোন ক্ষতি হবে না। নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটি হযরত হাসান থেকে 'মওকুফ' (তাঁর উক্তি) এবং 'মরফু' (রসূলুল্লাহর উক্তি) উভয় প্রকারে বর্ণিত আছে–

ثَلَاثَةٌ لَا يَخْلُوْ مِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَلَهُ مِنْهُنَّ مَخْرَجٌ وَمَخْرَجُهُ مِنَ الْحَسَدِ اَنْ لَّا يَبْتَغِىْ -

তিনটি বিষয় থেকে কোন মুমিন মুক্ত হয় না; কিন্তু তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ আছে। হিংসা থেকে নিষ্কৃতির পথ হচ্ছে সীমালঙ্ঘন না করা।

কিন্তু এর অর্থ তাই নেয়া উত্তম যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি; অর্থাৎ অন্তরে হিংসা থাকা অবস্থায় তা খারাপ মনে করতে হবে এবং এ কারণেই বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে।

সারকথা, মানুষ যদি কেবল অন্তর দ্বারা হিংসা করে এবং বাইরে তার কোন প্রভাব না থাকে, তবে এ ধরনের হিংসা যে গোনাহ তাতে মতভেদ আছে। আয়াত ও হাদীস দ্বারা তাই জানা যায়, যা আমরা লিপিবদ্ধ করেছি।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা গেল– শত্রুর সাথে মানুষের অবস্থা তিন প্রকার হয়ে থাকে– (১) স্বভাবের দাবী অনুযায়ী শত্রুর অমঙ্গল চাওয়া; কিন্তু বিবেক দ্বারা এই অমঙ্গল চাওয়াকে খারাপ মনে করা এবং নিজের প্রতি রাগ করা। এই প্রকার হিংসা নিশ্চিতরূপেই মাফ। কেননা মানুষের ক্ষমতায় এর বেশী কিছু নেই। (২) অন্তরে শত্রুর নেয়ামত বিলুপ্ত হওয়ার বাসনা রাখা এবং তার অমঙ্গলের মুখে অথবা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করা। এই প্রকার হিংসা নিশ্চিতরূপেই নিষিদ্ধ। (৩) কেবল অন্তর দ্বারা হিংসা করা, বাহ্যিক অঙ্গে তা প্রকাশ না পাওয়া; কিন্তু একে খারাপ মনে না করা। এই প্রকার হিংসার বৈধতায় মতভেদ আছে।

॥ সমাপ্ত ॥